উদয়নারায়ণপুর

মহানগর

প্রেমেন্দ্র মিত্র



প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৫০

দাম—দেড় টাকা

পূর্ব্বাশা প্রেস পি১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মহানগর

অরণ্য-পথ

দুর্লঙ্ঘ্য

মুহূর্ত্ত

জনৈক কাপুরুষের কাহিনী

নতুন বাসা

মহানগর

আমার সঙ্গে চল মহানগরে,—যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মত, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে আর চূড়ায়, অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মত মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এস মহানগরের পথে, যে পথ জটীল, দুর্ব্বল মানুষের জীবনধারার মত, যে পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মত, আর যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মত।

এ মহানগরের সঙ্গীত রচনা কবা উচিত, ভয়াবহ, বিস্ময়কর সঙ্গীত।

তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, উর্দ্ধমুখ কলের শঙ্খনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘব, শিকলের ঝনৎকার—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সজ্ঘর্ষের আর্ত্তনাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ, প্রিযার মত যে নদী শুযে আছে মহানগরের কোলে, তার জলের ঢেউযেব সুব, আর নগরেব ছাযাবীথির ওপর দিযে যে হাওয়া বয় তার, নির্জ্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্দ্ধস্ফুট যে কথা বলে তারো। সে সঙ্গীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি,—শব্দের বন্যার মত, আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওযার আওযাজ, মধ্য রাত্রে যে পথিক চলেছে অনির্দ্দিষ্ট আশ্রযের খোঁজে।

কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিযে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচিচিত্র, যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ,—সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে—সেই বিশাল দুর্ব্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে সঙ্গীতে।

এ সঙ্গীত রচনা কবার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি—মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী সমুদ্রের দু'একটি ঢেউ। মহাসঙ্গীতেব স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাতে মেটাবাব নয়,—জানি।

সঙ্কুচিত আড়ষ্টভাবে নদীব যে শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীব জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিযে উঠব নড়ালেব পোলের তলায় ফুটন্ত কদম গাছের নিশান-দেওয়া সেই পুরান পোণা ঘাটে। আমবা পেরিয়ে যাব পুবান সব ভাঙাঘাট, পেরিযে যাব ন্যাড়া-শিবের মন্দির, পেরিয়ে যাব ইটখোলা আর চালের আড়ৎ, কেঠোকাটি আর পাঁজাকরা টালি ও ইট আর সুরকি বালির গোলা। আমরা চলেছি পোণার নৌকায়। আমাদের নৌকাব খোলে টই-টম্বুর জল আর তাতে কিলবিল করছে মাছের ছানা। সেই পোণার চারা বিক্রী হবে কুণকে হিসাবে পোণাঘাটে।

আষাঢ় মাসের ভোর বেলা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য্য হয়ত উঠেছে পূবের বাঁকা নগর-শিখর-রেখার পেছনে, আমরা পেয়েছি মাত্র মেঘ থেকে চোয়ান স্তিমিত একটু আলো। সে আলোয় এদিকের দরিদ্র সহরতলীকে আরো যেন জীর্ণ দেখাচ্ছে। ভাঙাঘাটে এখনও স্নানে বড় কেউ আসে নি, গোলাগুলি

ফাঁকা, ধানের আড়তের ধারে শূন্য সব শালতি বাঁধা। সব খাঁ খাঁ করছে।

জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকা। মাঝিরা বড় নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে। এখন তারা ছইএর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে বসে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি করে গিযে বসেছে যে রতন তা কেউ জানে না,—সেই বুঝি রাত না পোহাতেই। নৌকা তখন মাঝ নদীতে।

বাদলা রাতে আকাশে ছিল না তারা। রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর। নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে, দুধারে জাহাজ আর ষ্টীমার, গাধাবোট আর বড় বড় কারখানার সব জেটি। অন্ধকারে তাদের রূপ দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু গাযে আলোর ফোঁটা, অগুন্তি ফোঁটা, কালো জলের এপার থেকে ওপারে। মেঘলা আকাশ ছেড়ে তারাগুলিই ত' নেমেছে নদীর ওপর।

রতন ভয়ে ভযে এসে বসেছে নিঃসাড়ে হালের কাছে। কে জানে বাবা বকবে কিনা? হয়ত ধমকে আবার দেবে পাঠিয়ে ছইএর ভেতর! কিন্তু সে কি থাকতে পারে এমন সময় ছইএর ভেতর,—নৌকা যখন পেযেছে মহানগরের নাগাল, আকাশের তারা যখন জলের ওপর নেমেছে! তার যে কত দিনের সাধ, কত দিনের স্বপ্ন! রতন দুচোখ দিয়ে পান করেছে আলো ছিটান এই নগরেব অন্ধকার আর নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, পাছে বাবা টের পায়, পাছে দেয় তাকে ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে। কিছুই ত বিশ্বাস নেই। বাবা ত তাকে আনতেই চায়নি বাড়ী থেকে। ছেলেমানুষ আবার সহরে যায় নাকি!

আর নৌকায় এতখানি পথ যাওয়া কি সোজা কথা। কি করবে সে সেখানে গিয়ে? কত কাকুতি মিনতি করে, কেঁদে কেটে, না রতন শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে নিমরাজী করিয়েছে। তবু নৌকায় তুলে বাবা তাকে শাসিয়ে দিয়েছে,—খবরদার, পথে দুষ্টুমি করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, দুষ্টুমি সে করবে না, কাউকে বিরক্তও না। তাকে যা বলা হবে তাই করতে সে রাজী। সে শুধু একবার সহর দেখতে চায়—রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই সহর। কিন্তু শুধু তাই জন্যে কি সহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা সে কথা এখন থাক।

কিন্তু রতনকে কেউ লক্ষ্য করে না, কিম্বা লক্ষ্য করেও কেয়ার করে না। রতন বসে আছে নিঃসাড়ে, শুধু সমস্ত দেহের রেখায় ফুটে উঠেছে তার ব্যগ্রতার প্রখরতা।

ধীরে ধীরে অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। এবার নদী রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম ছিল চারিধারে আবছা কুয়াসা। প্রকৃতিব পটের ওপর যেন রঙের এলোমেলো ছোপ, কোথাও একটু ঘন, কোথাও হালকা, সে রঙের ছোপ তখনও নির্দ্দিষ্ট রূপ দেয়নি। নীহারিকার মত আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরলতা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এই মাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে তুলছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে দেখতে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার জটিল মাস্তলগুলি উঠেছে ছোটখাটো অরণ্যের মত মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে অতিকায় অজগরের মত জলের ভেতর। রতনদের নৌকা যে দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে ভয়ে পার হয়ে যায় ছোট শোলার খেলনার মত। জলের আরেক

ধারে বিছান ছিল খানিকটা তরল গাঢ রঙের কুযাশা। সে কুয়াশা জমাট বেঁধে হয়ে গেল অনেকগুলো গাধা-বোটের জটলা—একটি জেটির চারিধারে তারা ভীড করে আছে। দূর থেকে মনে হয় ওরা যেন কোন বিশাল জলচরের শাবক—মাযের কোল ঘেঁসে তাল পাকিযে আছে ঘুমিযে। নদীব ওপরকার পর্দ্দা আরো গেল সরে। কল-কারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর তুপারে। জলের ওপর তাদের লৌহ-বাহু তারা বাডিয়ে দিযেছে। বাঁধান পাড থেকে বড বড ক্রেন উঠেছে গলা বাডিযে, তুই তীরে সদাগবী জাহাজেব আশে পাশে জেলে ডিঙ্গি আর খেযা নৌকা, ষ্টীমার আর লঞ্চ ভীড করে আছে। এই মহানগর। ভযে বিস্মযে ব্যাকুলতায অভিভূত হযে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।

তারপব তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর, চলেছে পুবাণো সহরতলীর ভেতর দিযে। বড নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল, হতাশ হযেছিল আরো বেশী। কিন্তু এই পুরান জীর্ণ সহরতলি দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা সে কথা এখন থাক্।

নদীর আরেকটা বাঁক ঘুবেই দেখা যায নডালের পোল। আগে থাকতে পোণার সব নৌকা এসে জুটেছে পোণাঘাটে। মুকুন্দ হাঁক দিযে এবার সবাইকে তোলে। লক্ষ্মণ উঠে তার কুণকে ঠিক করে। মাঝিরা গা যোডা দিযে ওঠে। আর রতন বসে থাকে উত্তেজনায়

উদ্‌গ্রীব হয়ে। তার চাপা দুটি পাতলা ছোট ঠোঁটের নীচে কি সঙ্কল্প আছে, জানে কি কেউ? বড় বড় দুটি চোখে তার কিসের ব্যগ্রতা? শুধু সহর দেখার কৌতূহল ত এ নয়! কিন্তু সে কথা এখনো থাক।

পোণাঘাটে এসে নৌকা লাগে। পোণাঘাটে আর জায়গা কই দাঁড়াবার। এরই মধ্যে মাটির হাঁড়ি দুধারে ঝুলিয়ে ভারীরা এসেছে দূর দূরান্তর থেকে পোণার চারা নিয়ে যেতে। তাদের ভীড়ের ভেতর পাড়ের কাদার ওপর কারা দোকান পেতে বসেছে পান বিড়ি আর তেলেভাজা খাবারেব। সরকারী লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাওনা আদায় করতে। দালালেরা ঘুরছে হাঁক ডাক করে।

পাড়ে আর জায়গা নেই, তবু মুকুন্দদাসের খাস নৌকার একটু নোঙর ফেলবার ঠাঁই মেলে। মুকুন্দ ত আর যে সে লোক নয। বর্ষার কটা মাসে তার গোটা ছয়েক পোণার নৌকা আনাগোনা করে এই পথে।

মাঝিরা এব মধ্যেই নৌকার খোল থেকে জল ছেঁচে ফেলতে স্থরু করছে একটু-আধটু। লক্ষ্মণ কুণকে পরখ করছে—মাছ মেপে দেবার সময় খানিকটা জল রেখে হাত সাফাই করতে সে ওস্তাদ। মুকুন্দদাস নৌকো থেকে জলে নেমে ডাঙ্গায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে,—"তুই নামলি যে বড়।"

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে,—"আচ্ছা কোথাও যাসনি যেন, ওই কদম গাছের তলায় দাঁড়াগে যা।"

রতন তাই করে। কদম গাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে

পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁৎলে নোংরা হয়ে গেছে। পোণা-চারার হাটে কদম ফুলের কদর নেই।

রতনের চারিধারে হট্টগোল।

"চাপড়াও না হে, নইলে বাড়ী গিয়ে মাছচচ্চড়ি খেতে হবে যে।"

"একটা নতুন হাঁড়িও জোটেনি। ভাতের তিজেলটাই এনেছ বুঝি টেনে। তারপর মাছ যখন ঘেমে উঠবে তখন হবে দালাল বেটার দোষ।"

ভারীরা কেউ এসেছে খালি হাঁড়ি নিয়ে, কারুর কেনা প্রায় সাঙ্গ হ'ল। বসে বসে তারা হাঁড়ির জল চাপড়ায়, মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীর ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদম রেণু মিশে গেছে।

রতন কিন্তু কদমতলায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করে সে ত সহরে আসেনি। সারাপথ সে মনের কথা মনেই চেপে এসেছে; মুখ ফুটে একবার বুঝি লক্ষ্মণকে গোপনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল,—"হ্যাঁ কাকা পোণাঘাটের কাছেই উল্টোডিঙি না?"

লক্ষ্মণ কাকা হেসে বলেছে—"দূর পাগলা, উল্টোডিঙি কি সেথা! সে হল কতদূর।" তার পর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—"কেনরে, উল্টোডিঙির খোঁজ কেন? উল্টোডিঙির নাম তুই শুনলি কোথা?"

কিন্তু রতন তারপর একেবারে চুপ। তার পেটের কথা বার করে কার সাধ্য।

কদমতলায় দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে রতন চারিদিকে তাকায়। তার বাবা কাজে ব্যস্ত, রতন এক সময়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কাউকে

কিছু জিজ্ঞাসা করতে এখানে তাব সাহস হয না। একটা দিক খেযালমত ধরে সে এগিযে যায়।

মহানগরের বিশাল অবণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুব খোঁজে,—কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মত শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে? এই অরণ্যে নিজেব আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে—তাব দুঃসাহস ত কম নয।

অনেক দূর গিযে বতন সাহস কবে একজনকে পথ জিজ্ঞাসা কবে। লোকটি অবাক হযে তার দিকে তাকায, বলে,—"এত অন্য দিকে এসেছো ভাই, উল্টোডিঙি ওইদিকে, আর সে ত' অনেক দূব।"

—অনেক দূর। তা' হোক, অনেক দূরকে বতন ভয করে না। রতন অন্যদিকে ফেরে। লোকটি কি ভেবে তাকে জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি একলা যাচ্ছ অতদূর। তোমার সঙ্গে কেউ নেই?"

রতন সঙ্কুচিত ভাবে বলে,—"না।"

লোকটির কি মনে হয, একটু শক্ত হযেই জিজ্ঞাসা কবে—"বাডী থেকে পালিযে যাচ্ছ না ত? উল্টোডিঙিতে কাব কাছে যাচ্ছ?"

রতন ভয়ে ভয়ে বলে ফেলে—"সেখানে আমার দিদি থাকে।" তারপর তাডাতাডি সেখান থেকে চলে যায়। লোকটা যদি আবো কিছু জিজ্ঞাসা করে, যদি ধরে নিযে যায় আবার তার বাবার কাছে।

তাহলে এবার বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিযে খুঁজে পায না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে খুঁজে বার করবে। সহর মানে তার দিদি।

বাড়ীতে থাকতে সে ভেবেছে সহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে ধারণাকে উপহাস করেছে, কিন্তু তবু সে হতাশ হয় নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে'

কিন্তু দিদিকে খোঁজার কথা ত কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়ীতে মানা, তাকি সে জানে না। অনুচ্চারিত কোন নিষেধ তার শিশুমনের ব্যাকুলতাকে মূক করে রেখে দেয়।

তাই সে সারা পথ এসেছে মনের কথা মনে চেপে। তাই সে একা বেরিয়েছে দিদির সন্ধানে।

দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হলে তার যে কিছু ভালো লাগে না। ছেলে বেলা থেকে সে ত' মাকে দেখে নি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হয়ে দিদি গেছল শ্বশুরবাড়ী। তবুও তাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি। কাছাকাছি দু'টি গাঁ, রতন নিজেই যখন তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশী দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন করে বুঝবে!

তারপর কি হল কে জানে। একদিন তাদের বাড়ীতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসেছে ভীড় করে, ভীড় করে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে। ছেলমানুষ বলে তাকে কেউ কাছে ঘেঁসতে দেয় না। তবু সে

শুনেছে—দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে। তাকে আবার কেড়ে আনতেই ত হয়। কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হয়েছে। তার পর সে আরো কিছু শুনেছে, শিশুর মন অনেক বেশী সজাগ। দিদিকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।

এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেছে দিদিকে ধরে! তারা হয়ত দিদিকে মারছে, হয়ত দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়ত রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। একথা ভেবে তার যেন আরও কান্না পায়।

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন—"কান্না কেন বাবা?"

চুপি চুপি রতন বলেছে, "দিদি যে আসছে না বাবা।"

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে,—"আসবে বৈকি বাবা, শ্বশুর বাড়ী থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে।"

রতন আর কিছু বলে নি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার বড় ভয় হয়েছে।

তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগা সাহেব, পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূরদেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে! রতনের আনন্দ আর ধরে না। দিদি এতদিন বাদে তাহলে আসছে।

কিন্তু কোথায় দিদি! একদিন, দুদিন, ব্যাকুল ভাবে রতন অপেক্ষা করে, কিন্তু দিদি আসে না। দিদিকে ফিরে পাওয়া গেছে, তবু দিদি

কেন আসে না রতন বুঝতে পারে না। দিদির ওপরই তার রাগ হয়। কতদিন রতন তাকে দেখেনি তাকি তার মনে নেই। দিদি নিজে চলে আসতে পারে না? আর বাবাই বা কেমন, দিদিকে নিযে আসছে না কেন? রতনের সকলের ওপর অভিমান হযেছে।

হযত দিদি চুপি চুপি শ্বশুরবাড়ী গেছে ভেবে একদিন সকালে রতন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে ত দিদি নেই। সেখানে কেউ তার সঙ্গে ভাল করে কথাবার্ত্তা পয্যন্ত কয় না, দাদাবাবু তাকে দেখতে পেযেও দূর থেকে না ডেকে চলে যান। মুখখানি কাঁদ কাঁদ করে রতন সেদিন বাড়ী ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে বাবার কাছে কেঁদে সে আব্দার করেছে—"দিদিকে আনছ না কেন বাবা?"

সেইদিন মুকুন্দ তাকে ধমকে দিয়েছে।

তারপর থেকে দিদি আর আসে নি। দিদি নাকি আর আসবে না।

কিন্তু রতন মনে মনে জানে, তাকে কেউ ডাকতে যায় নি বলেই অভিমান করে দিদি আসে নি।

রতন যে জানে না দিদি কোথায থাকে, না হলে সে নিজেই গিয়ে দিদিকে ডেকে আনত।

কিন্তু কেমন করে সে জানবে দিদি কোথায় আছে। কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই যে বলতে নেই। রাত্রে সে চুপি চুপি শুধু দিদির জন্যে কাঁদে, দিদি কেমন করে তাকে ভুলে আছে ভেবে মনে মনে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।

কিন্তু শিশুর মন আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশী সজাগ।

শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়, অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে, যে, দিদি থাকে সহরে,—রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই সহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে—উল্‌টোডিঙ্গির নাম। বাতাসে কথা ভেসে আসে, বিনিদ্র ভালবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।

তাই সে কাকুতি-মিনতি করে এসেছে মহানগরে, তাই সে চলেছে সন্ধানে।

দিদিকে সে খুঁজে বার করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাক্‌তে কিছুতেই পারবে না। এমনি গভীর তার বিশ্বাস।

রতনকে আমরা এখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকেই আসে অনেক কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরো বড় কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেম্নি যাবে হারিয়ে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কিন্তু তা যাবে না। পৃথিবীতে কি সম্ভব কি অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আষাঢ় মাসের আকাশ, মেঘে ঢাকা বলে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শুকনো কাতর মুখে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলায় ছাওয়া একটি মেটে বাড়ীর দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সঙ্গে করে।

রতন অনেক পথ ঘুরেছে, অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালবাসা কি না পারে।

খানিক আগে হায়রাণ হযে খোঁজ কবতে করতে রতন দূরে একটি মেযেকে দেখতে পায়, উৎসাহভরে সে চীৎকার করে ডাকে—"দিদি।"

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াতেই রতন হতাশ হযে যায়। তার দিদি ত অমন নয। কুণ্ঠিত ভাবে সে অন্য দিকে চলে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটি তাকে ডেকে বলে—"শোন"।

কাছে গেলে তার ক্লান্ত শুক্‌নো মুখেব দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—"কাকে খুঁজছ ভাই?"

রতন লজ্জিত ভাবে তার দিদির নাম বলে। মেযেটি হেসে বলে—"তোমার দিদির বাড়ী বুঝি চেন না, চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেটে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িযে এখন মেয়েটি ডাকে—"ও চপলা তোকে খুঁজতে কে এসেছে দেখে যা।"

ভেতর থেকে চপলাই বুঝি রুক্ষ স্বরে বলে—"কে আবার এল এখন?"

"দেখেই যা না একবার।"

চপলা দরজাব কাছে এসে থমকে দাঁড়ায। রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কষ্ট হয। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে।

দুইজনেই খানিকক্ষণ থাকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। যে মেয়েটি রতনকে সঙ্গে করে এনেছে সে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বলে,—"তোর নাম করে খুঁজছিল, তাই তোর ভাই ভেবে বাড়ী দেখাতে নিয়ে এলাম। তোর ভাই নয়?"

উত্তর না দিয়া চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা গলায় বলে,—"তুই একা এসেছিস।"

রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।

মহানগরের পথে ধূলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখন কখন পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সবকিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।

চপলা রতনকে ঘরে নিয়ে যায়। সে ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন করে সাজান হতে পারে, এত সুন্দর জিনিষ সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন করে জানবে? এত জিনিষ দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রথম,—"এসব তোমার দিদি?"

চপলার অকারণ চোখের জল তখনও শুকোয়নি, একটু হেসে সে বলে—"হ্যাঁ ভাই।"

কিন্তু দিদির ঘর যেমনই হোক তা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না ত। আসল কথা রতন ভোলেনি। সে হঠাৎ বলে—"তোমায় কিন্তু বাড়ী যেতে হবে দিদি।"

চপলা বুঝি একটু চমকে ওঠে তারপর ম্লান ভাবে বলে—"আচ্ছা যাব ভাই, এখন ত তুই একটু জিরিয়ে নে।"

"কিন্তু জিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। আমাদের নৌকা কাল সকালেই ছাড়বে, কিনা। এসব জিনিষ কেমন করে নেব দিদি?"

এবার চপলা চুপ করে থাকে।

হঠাৎ কেন বলা যায় না একটু ভীত হয়ে রতন জিজ্ঞাসা করে—"একটু জিরিয়ে নিয়েই যাবে ত দিদি ?"

দিদির মুখে তবু কথা নেই। দিদি জিনিষপত্র নিয়ে যাবার ভাবনাতেই হয় ত রাজী হচ্ছে না ভেবে রতন তাড়াতাড়ি বলে—"এসব জিনিষ একটা গরুর-গাড়ী ডেকে তুলে নেব কেমন দিদি ?"

চপলা কাতর মুখে বলে ফেলে—"আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই।"

যাবার উপায় নেই। রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় বাবার রাগ, মনে পড়ে বাড়ীতে দিদির নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ নিষেধ। সত্যই বুঝি দিদির সেখানে যাবার উপায় নেই। বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই।

তারপর হঠাৎ আবার তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে,—"আমিও তা হলে যাবনা দিদি।"

"কোথায় থাকবি ?"

"বাঃ তোমার কাছে ত।" বলে রতন হাসে, কিন্তু চপলার মুখ যে আরো ম্লান হয়ে আসছে তা সে দেখতে পায় না।

তারপর খেয়ে দেয়ে সারা বিকাল দুই ভাই বোনের গল্প হয়। কত কথাই তাদের আছে বলবার, জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে তত চপলা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। একবার সে বলে—"তুই যে চলে এলি একলা, বাবা হয়ত খুব ভাবছে।"

দিদির প্রতি অবিচারের জন্য বাবার ওপর রতনের একটু রাগই হয়েছে, সে তাচ্ছিল্য করে বলে—"ভাবুক গে।"

খানিক বাদে চপলা আবার বলে, "এখান থেকে নড়ালের পোল অনেকখানি পথ, না রতন ?"

রতন এপথ পার হয়ে ত এসেছে। গর্ব্বভরে সে বলে—"ওরে বাবা, সে বলে কোথায় !"

"পয়সা নিয়ে তুই ট্রামে করে, না হয় বাসে, যেতে পারিস্ না ?"

"বাঃ আমি কি যাচ্ছি নাকি ?"

দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে কিন্তু থমকে যায়। দিদির চোখে জল।

মাথা নীচু করে চপলা ধরা গলায় বলে—"এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই।"

রতন কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে নেই ! আচ্ছা সে চলেই যাবে। কখ্খনো, কখ্খনো আর দিদির নাম করবে না, বাবার মত। ধীরে ধীরে সে বলে—"আচ্ছা আমি যাব।"

মেঘলা আকাশে একটু আগে থাকতেই আলো এসেছে ম্লান হয়ে। চপলা উঠে তার আলমারী থেকে চারটে টাকা বার করে রতনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে—"তুই খাবার খাস্।"

চার টাকায় অনেক পয়সা, তবু আপত্তি করবার কথাও আর রতনের মনে নেই। দিদি যে এক্ষুনি তাকে চলে যেতে বলেছে তা বুঝে সে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তার সমস্ত বুক গেছে ভেঙ্গে।

রতন আর ঘরে দাঁড়ায় না, আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

দিদির মুখের দিকেও আর না চেয়ে গলি দিয়ে সে সোজা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। মুখের দিকে চাইলেও হয়ত দিদির অবিশ্রান্ত চোখের জলের মানে সে বুঝতে পারত না।

চপলা পেছন থেকে ধরা গলায় বলে—"বাসে করে যাস রতন, হেঁটে যাসনি।"

রতন সে কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু বড় রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কি সে ভেবেছে কে জানে।

চপলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে,—"বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।"

বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্য্যন্ত সবল, এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মত গাঢ়।

অরণ্য-পথ

ঘুমাইযা পড়িযাছিলাম। গভীর রাত্রে ষ্টীমার কখন ছাড়িযাছে টের পাই নাই। বিমল গাযে ঠেলা দিয়া তুলিযা দিতে ধড়মড় করিযা জাগিযা বসিলাম।

অন্ধকারে পাযের তলায় গভীর জলের আলোড়ন শব্দ—হঠাৎ শুনিলে ভয হইবার কথা।

ষ্টীমারের দুই পাশে মাল-বোঝাই গাধাবোট বাঁধা। তাহারা দৃষ্টি একেবারে আড়াল করিযা আছে। কোনও দিকে চাহিযা ষ্টীমার চলিতেছে কিনা বুঝিবার উপায নাই। শুধু ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে বিশাল দারুদেহের কম্পনে ও জলের প্রবল আলোড়ন-শব্দে ষ্টীমারের বেগ অনুমান করা যায।

ডেকের উপর আমাদের আসন। আইনমতে ডেকের মাঝখানে একটি উজ্জ্বল হউক ম্লান হউক আলো জ্বলিবার কথা। কিন্তু এদিকের জলপথে শুধু মালপত্রই যাতাযাত করে—মানুষ যে করে না তাহা নয় কিন্তু তাহারা নগণ্য। তাহাদের জন্য সারা রাত বাতি খরচ করা কোম্পানী প্রযোজন মনে করে না।

অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইযা ভারী অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। যখন উঠিয়াছিলাম তখন প্রথম রাত্রি। যাত্রীর ভিতর আমরা তখন দুইজনই মাত্র ছিলাম। তাহার পর কতজন উঠিযাছে কে জানে। অন্ধকারে দূরে অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছিল—মনে হইল হয়ত নূতন যাত্রী পরে উঠিয়া থাকিবে। তাহাদের দেখিতে পাইলেও

সময়টা কোনরকমে চরিত্র-পর্য্যালোচনা করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু ভিতবে বাইরে যখন দেখিবার কিছুই নাই তখন অকারণে জাগিয়া বসিযা কি করিব।

ঘুম হইতে জাগাইয়া তোলাব জন্য বিমলকে ধমক দিলাম।

"মিছি-মিছি জাগালি কেন বলত?"

"বা:—ষ্টীমার ছাডলে জাগিযে দিতে বলেছিলে না।"

বলিয়াছিলাম সত্যই। তখন আশা ছিল ষ্টীমার ছাডাটা অত্যন্ত একটা রহস্যময ব্যাপাব হইবে। মনে হইযাছিল দীপালোক বিক্ষত দুই তীবের মধ্য দিযা ভাসিয়া যাইতে-যাইতে ভাগীরথীর অন্ধকার বক্ষ হইতে নিদ্রিত মহানগবীকে একটা জমকালো রকমেব বিদায় নমস্কার দিযা যাইব।—তোমার পাষাণ বন্দীশালায অনেক ঘুরিয়াছি—প্রস্তর কঠিন পথে চরণ জর্জ্জরিত হইযাছে, দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা ঠুকিযাছে—তবু কিছু মিলে নাই। হে উদাসীন নগবী, তাই বিদায লইলাম। এমনি সব বড বড কথা বুঝি মনেব মধ্যে রচনা করিযা-ছিলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। মহানগরী অত্যন্ত অশ্রদ্ধাভরে আমাদের বিদায দিযাছে। জানোযারের মত পিঁজরাবন্দী হইয়া যাইতে যাইতে কাব্য করা শোভা পায না।

বলিলাম,—'বলেছিলাম ত, কিন্তু অন্ধকারের ভেতর ভূতের মত জেগে বসে থেকে কি হবে?'

বিমলের উৎসাহ কিছুতেই ম্লান হয় না। বলিল,—"চলনা একটু ঘুবে আসি।"

আগেই বলিয়াছি সমস্ত ষ্টীমার মালপত্রে বোঝাই। তাহার ভিতরে

অন্ধকারে পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে ঘুরিবার বাসনা তখন হইল না। বিমলকে তাহার অন্যায় চঞ্চলতার জন্য একটু ভর্ৎসনা করিতে যাইতেছি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ,—জলতরঙ্গের নীচের পর্দ্দা হইতে সর্ব্বোচ্চ পাত্র পর্য্যন্ত কে যেন দ্রুতবেগে যষ্টি টানিয়া দিয়াছে।

অবশ্য নারীকণ্ঠ—কিন্তু স্বর শুনিয়া মনে হয় বালিকার চাপল্য তাহাতে বেশী।

অন্ধকারে এই কণ্ঠস্বর একেবারে যেন অভিভূত করিয়া দিল। মুগ্ধ মন এই ধ্বনির সাহায্যে সেই মুহূর্ত্তে যে মুখখানি রচনা করিয়া ফেলিল, বাস্তবের সহিত হয়ত তাহা কিছুতেই মিলিবে না, তবু তখনকার মত তাহার স্নিগ্ধতায় একেবারে আবিষ্ট হইয়া গেলাম।

দ্বিতীয়বার হাস্যধ্বনি উঠিতে না উঠিতে মাঝখানে থামিয়া গেল। কে যেন সহসা জোর করিয়া তাহা চাপা দিয়াছে।

উৎসুকভাবে হাস্যধ্বনির পুনরাবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করিলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু বিশাল পাথর চাপা দিয়া কে বুঝি নির্ঝরিণীর মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আর কিছুই শোনা গেল না। ব্যাপারটা একটু যেন রহস্যময়, অন্ততঃ ষ্টীমারের তলায় জলের কল্লোল-শব্দ, নদীবক্ষের অন্ধকার এবং হাস্যধ্বনির আকস্মিক পরিসমাপ্তি আমাদের কাছে তাহাকে রহস্য-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল।

শব্দটা কোন দিক হইতে আসিয়াছিল বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিবার উপায় নাই।

ডেকে আলো না রাখিবার জন্য এইবার সত্যই ষ্টীমার কোম্পানীর উপর রাগ হইতেছিল।

বিমল আমার মতই কৌতূহলী হইযাছে বুঝিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় ষ্টীমারটা ঘুরিয়া আসিবার আর সে নাম করিল না। আমার পাশেই নীরবে কম্বলের উপর শুইযা পডিল্।

খানিক বাদে শুধু সে জিজ্ঞাসা করিল 'রাত এখন কত?'

মনে মনে হাসিযা বলিলাম,—'জানি না।'

ভোব হইতেই জাগিযা উঠিলাম। ফাল্গুন মাস তবু নদীর প্রবল জোলো হাওযায় যেন শীত শীত করিতেছিল। পাশে বিমলকে দেখিতে পাইলাম না। সে কতক্ষণ উঠিয়া গিযাছে কে জানে।

ভোরের নীলাভ আলোয ডেকের সমস্তই এবার দেখা যাইতেছিল। উঠিযা এদিক ওদিক একবার পাযচারী করিযা বেডাইলাম। এ ষ্টীমারে অধিকাংশই ডেকেব যাত্রী। ফাষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাস নামে একটা সুসজ্জিত অংশ আছে কিন্তু সেখানে একটা যাত্রীও হয না। সে দিকের কাঠেব দরজায তালা বন্ধই থাকে।

বোঝা গেল আমাদেব পরে বেশী যাত্রী ওঠে নাই। একটি কৃষক পরিবার একদিকে গোটাকতক কেরোসিন কাঠের বাক্সের পাশে তাহাদের জায়গা করিয়া লইয়াছে। দুটি পুরুষ একটি পাঁচ বছরের রুগ্ন শিশু একটি বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা করিযা জানিলাম তাহারা কাকদ্বীপে নামিয়া যাইবে।

আর একদিকে দুই বৃদ্ধ সাধু সকাল বেলাই গঞ্জিকা সেবনের উদ্যোগ করিতেছিল। আমার বেশভূষা দেখিয়াই বোধ হয় সাহস করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল। নিমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করিতেই হইল।

কি যে খুঁজিতেছিলাম সে কথা গোপন কবিবার চেষ্টা করা আর নিষ্ফল। ডেকের নানা জাযগায স্তূপাকার করিযা কোথাও বা জিনিষ বোঝাই কেরোসিন কাঠের বাক্স, কোথাও বা ক্যানাস্তাবা, কোথাও বা বস্তা রাখা হইযাছে। সেই মাল পত্রের স্তূপের দরুণ ডেকের উপর অনেকগুলি নিভৃত কোটর সৃষ্টি হইযাছে। একদিক হইতে সবগুলি দেখা যায না। হযত কোথাও আনাচে কানাচে আর কোন যাত্রী আছে মনে করিযা আরো একটু বিশদভাবে অনুসন্ধান করিলাম। কোন ফল হইল না। অমন রহস্যময হাস্যধ্বনি তুলিতে পারে এমন কোন নারী দূরে থাক ষ্টীমারে আর যাত্রীই নাই। ব্যাপারটা সত্যই বড বিস্ময়জনক ঠেকিতেছিল। তাহাব উপর সকাল হইতে বিমলটাই বা গেল কোথায? সমস্ত ডেকে এবং সাবেঙেব সহিত ভাবসাব কবিয়া ইঞ্জিনের দিকটা ঘুরিযাও তাহার দেখা পাইলাম না।

বিমলের এই ধরণের অন্তর্ধানে সত্যই একটু চিন্তিত হইলাম। এই কয়েকদিনের আলাপে তাহাকে যেটুকু চিনিযাছি তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয। বন্ধু ও সঙ্গী বলিয়া তাহার স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা যতই আমার উপর থাক না কেন, মনের খেযালের মুহূর্তে আমাকে চিরদিনের মত ছাডিয়া যাইতে সে যে এতটুকু দ্বিধা করিবে না তাহা আমি ভাল রকমই জানি।

তাহার সহিত আলাপ হইযাছে মাত্র এই কয় মাস। কেমন করিযা

আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে সে যে আসিয়া জুটিল তাহা ভাবিলে এখনও বিস্ময় লাগে।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা। সকালে স্নান করিবার জন্য মানুষের স্রোতে যখন হইতে মিশিয়াছি তখন হইতে পৃথক সত্তা আর নাই। নিজের ইচ্ছাশক্তি আর প্রয়োগ করিতে হয় না, ভিড়ের ভিতর কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়াই শুধু চারিদিকের ঠেলায় আমারই মত বহু স্নানার্থীর সহিত জমাট বাঁধিয়া আগাইয়া চলিয়াছি। স্নান শেষ করিয়া সেইভাবেই ফিরিতেছিলাম। দুচোখ যতদূর যায়, দেখা যায় শুধু নরমুণ্ড—যেন লক্ষশির একটা বিরাট প্রাণী নড়িতেছে। তাহার দেহ দেখা যায় না।

কপালের ঘাম চোখে আসিয়া পড়িয়া চোখ জ্বালা করিতেছে। হাত তুলিয়া যে ঘামটুকু মুছিব তাহারও উপায় নাই। চারিধারের চাপে দুইটা হাত জম্পেশ হইয়া নিজের গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে। যে স্রোতের সঙ্গে আসিয়াছি সেই স্রোতের ভিতরই থাকিতে হইবে। এখনও মাইল খানেক পথ না পার হইলে মুক্তি নাই।

মানুষের ভীড় শাসনের অতীত হইয়া যাওয়ার কিছুদূরে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য কয়েকটা হাতী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই হাতীর একটা আমাদের দিকে আসিলে কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেও করিবার কিছু নাই। শামুকের মত গতিতে যেমন অগ্রসর হইতেছি, তেমনি হইতে হইবে।

সমুদ্রকল্লোলের মত, অযুত মানুষের সেই পদধ্বনি ও কণ্ঠস্বরের সম্মিলনের ভিতর হঠাৎ নিকটে অদ্ভুত আওয়াজ শুনিলাম। আর্ত্ত এক ছাগ-শিশুর চীৎকার।

কষ্টে ঘাড় বাঁকাইযা দেখিলাম আহত এক ছাগশিশুকে দুই হাতে ভীড়ের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া একটি যুবক আমারি কিছু পিছনে আসিতেছে। ছাগশিশুটি পথভুল করিযা পুণ্যলোভী এই জনতার মধ্যে কেমন করিযা আসিযা পড়িয়াছিল কে জানে। স্নানার্থীদের পদ-নিষ্পেষণে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভের পথ তৈযারী হইযা গিয়াছে।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। পাযের চাপে তাহার মাথায আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সামনের দুইটা পা একেবারে ভাঙ্গিযা ঝুলিযা পড়িযাছে। একটা দিকের চোখ আর নাই। খুলির খানিকটা অংশের সহিত উপড়াইয়া গিযাছে। যায নাই শুধু প্রাণটুকু। যন্ত্রণায তাই সে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল।

যে ছেলেটি ছাগ-শিশুকে বহন করিযা আনিতেছিল তাহার চারিধারে ভীড়ের ভিতরই ভযানক গণ্ডগোল সুরু হইযাছে। ছাগশিশুর মাথার উপর হইতে টপ টপ করিযা রক্ত সদ্যস্নাত জনতার মাথার উপর পড়িতেছে। তাহারা প্রতিবাদ ত করিবেই। সাধ্য থাকিলে তাহারা ছেলেটিকে সেখানেই বোধ হয় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিত কিন্তু জিহ্বা সঞ্চালনের সুযোগ থাকিলেও হাত পা নাড়া একপ্রকার অসম্ভব।

ভিড়ের ঠেলায কখনও কখনও ছেলেটি আমার কাছাকাছি আসিযা আবার সরিযা যাইতেছিল। একবার সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'এটিকে কোথায় পেলে হে?'

ছেলেটি সেই অবস্থাতেই হাসিয়া বলিল 'এটি পুণ্যফল। কুড়িযে পেয়েছি!'

খানিকক্ষণ পাশের একটা ধাক্কা সামলাইতে কথা কহিবার আর

অবসর পাইলাম না। আবার একটু সুবিধা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম 'ওর ত স্বর্গলাভের আর বিলম্ব নেই। কেন আর বয়ে নিয়ে নিজেকে আর আশে পাশের লোককে কষ্ট দেওয়া।'

ছেলেটি কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। যাহাদের গায়ে রক্তের ফোঁটা পড়িয়াছে তাহাদের তীব্র কণ্ঠ ও ছাগশিশুর আর্ত্তনাদে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য আমি তাহার নিকট হইতে একটু আগাইয়া যাইতেও বাধ্য হইলাম।

আবার যখন দেখা হইল তখন ছাগশিশুর পরমায়ু প্রায় বোধ হয় শেষ হইয়া আসিতেছে। মাথাটা নেতাইয়া পড়িয়াছে—শব্দ করিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—'রক্তে যে একেবারে নেয়ে গেছ হে।'

ছেলেটির মুখে এবার হাসি নেই। গম্ভীর মুখে বলিল 'হুঁ, যোগের স্নানটা ভাল করেই হোল।' এবার আমরা ভীড়ের নূতন একটা আবর্ত্তনের মাঝে পড়িয়া প্রায় পাশাপাশি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার মাথায়, মুখে, কাঁধে ছাগশিশুর টাটকা রক্ত পড়িয়া ইতিমধ্যেই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ একভাবে উর্দ্ধবাহু হইয়া পশুটিকে বহন করিবার জন্য হাত তাহার কাঁপিতেছিল।

বলিলাম—'কষ্টও ত খুব কম হচ্ছে না।'

ছেলেটি আমায় অবাক করিয়া দিয়া বলিল 'এখন বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, যা যন্ত্রণা পেয়েছে আগে যদি দেখতেন। এতগুলো মানুষের চাপ, একটা হাতী পড়লে থেৎলে গুঁড়ো হয়ে যায় আর এ ত

একটা বাচ্চা ছাগল। বেটাকে উদ্ধার কবতে গিযে আর একটু হলে আমিই গেছলাম আর কি।'

ইহাব পব কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। ছেলেটি খানিক বাদে বলিল, 'আমাব চোখেব ওপব বক্ত পড়ে চোখটা করকব করছে, ভালো দেখতে পাচ্ছিনে—দেখুন ত একেবারে শেষ হযে গেছে কিনা।'

বলিলাম,—'প্রায শেষ হযে এসেছে, একটু মুখটা নডছে মাত্র।'

ছেলেটি শুধু বলিল, 'একটু যদি জল পেতাম।'

সব ভুভোগেবই একটা শেষ আছে। এক জাযগায আসিযা ক্রমশঃ ভীড হালকা হইতে আবম্ভ করিল এবং পরে আরো কিছুদূবে গিয়া যখন দুধাবে হাত পা ছডাইবাব জাযগা পাইলাম তখন প্রথমটা মনে হইল এত বড সৌভাগ্য মানুষের জীবনে খুব কমই আসিয়াছে।

ছেলেটি ইতিমধ্যে আবার পিছনে পডিযা গিযাছিল। তাহার কথা ভুলিযাও বুঝি গিযাছিলাম। হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল,—'ও দাদা, চলে যাচ্ছেন যে।'

ফিরিযা দেখিলাম সেই ছেলেটি। ছাগশিশুটিকে এবার সে বুকের উপর নামাইযা আমার কাছে আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'কতদূরে থাকেন?'

জানাইলাম যে নিকটেই একটি অস্থাযী পান্থশালায কযেকদিনের মত থাকিবার স্থান যোগাড কবিয়াছি।

ছেলেটি বলিল 'তাহলে চলুন তাডাতাডি। বেটাকে একটু জলটল দিযে দেখি।'

আমার পান্থশালায় আসিযা ছাগশিশুর জন্য অনেক কিছুই সে

করিল, কিন্তু স্নানার্থীদের চরণস্পর্শের পুণ্যের জোর অনেক বেশী। ছাগশিশুকে অক্ষয় স্বর্গ হইতে কোন মতেই বঞ্চিত করা গেল না। ছেলেটির হাতের একটু জলপান করিবার চেষ্টা করিয়া বার দুই পা গুলি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া একেবারে স্থির হইয়া গেল।

বলিলাম, 'যোগের স্নানের পর আর স্নান করতে নেই যে। কিন্তু গা-ময় ও রক্ত নিয়েই বা থাকবে কি করে?'

ছেলেটি বলিল 'হুঁঃ, যোগে আর স্নান করা হোল কখন? অর্দ্ধেক পথ থেকেই ফিরতে হল যে।'

কথাটা বিশ্বাস করা সহজ নয়। দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া জন-সমুদ্রের মাঝে এই নিদারুণ নিগ্রহ সহ্য করিয়া কেহ যে মাঝ পথ হইতে শুধু একটা মুমূর্ষু ছাগশিশুর জন্য স্নান শেষ না করিয়া ফিরিতে পারে ইহা আমার পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া ছেলেটি একটু হাসিয়া বলিল,—'তা মস্ত বড় একটা কাজ করে ফেলেছি—কি বলেন দাদা। সেই কবে বুদ্ধদেব একবার ছাগল ছানার জন্যে সমস্ত জপতপ পুণ্যের সঙ্গে প্রাণটা ফাউ দিতে চেয়েছিলেন আর এতদিন বাদে আমি কুম্ভ মেলার পুণ্যটা হেলায় ছেড়ে দিলাম। প্রাণটাও দিয়াছিলাম আর কি।'

তাহার কথায় হাসিয়া ফেলিয়া তাহার স্নানের বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় গেলাম।

ছেলেটি সেদিন আমাদের পান্থশালাতেই থাকিয়া গেল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অবস্থানটিকে দীর্ঘ করিতে তাহার বিশেষ আপত্তি নেই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এ রকম আশ্রয়হীন হইয়াই

সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শুধু কুম্ভমেলার এই কয়দিন নয়, আজ ছয় বৎসর ধরিয়া।

তাই বলিয়া তাহার রুচির খুঁত ধরিবার কিছু নাই। পান্থশালার আহার্য্যের ও শয়নের ব্যবস্থার অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিতে ছাড়িল না। রান্নার দোষ ধরিয়া বেশ দুকথা পাচক ব্রাহ্মণকুমারকে শুনাইয়া দিল এবং আমাকে এক সময় সহজ ভাবে জানাইল 'দেখ, দাদা, মাংস নইলে আমার খাওয়ার জুৎ হয় না।'

বিমলের সহিত এমনি করিয়া পরিচয়। কুম্ভমেলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বিমল আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার নাম করিল না। আকার ইঙ্গিতে তাহাকে আমার অবস্থার কথা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি—শীঘ্রই যে আমার এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহাও বলিতে ভুলি নাই কিন্তু বিমল তাহাতে বিচলিত হয় নাই। একদিন আমায় স্পষ্ট বলিয়া দিল 'তোমার ওসব হেঁয়ালি কথা-টথা আমায় শুনিও না দাদা, তোমায় এখন আমি ছাড়ছিনে। আমার ভাল লেগে গেছে।'

ইহার পর আর কথা চলে না। বিমলকে লইয়াই কলিকাতায় ফিরিলাম। হাঙ্গাম অবশ্য কম নয়। নিজের আশ্রয় জোটানই ভার। বিমলকে লইয়া আরো ফাঁপরে পড়িলাম। সে কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার। আশ্রয় ও আহার সংগ্রহের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া সে পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। ত্রুটি হইলে অনুযোগ করিতেও ছাড়ে না।

দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে অনেক কষ্টে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তাঁহার

গৃহটিকে নগরের যাবতীয় খঞ্জ, আতুর, পশুপক্ষী ও মানুষের পিঁজরাপোল বানাইবার বিমলের যে সাধু ইচ্ছা ছিল তাহা আমার জ্ঞাতি অনুমোদন করিতে পারিলেন না। বিমলের সহিত তাঁহার তুমুল বচসা হইয়া গেল। মহানগরে অন্নসংস্থানের জন্য উপায়ও এতদিনে খুঁজিয়া পাই নাই। একদিন তাই বিমলকে লইয়া বিদায় হইলাম। তারপর তাহারই অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যেই এই জল-পথে চলিয়াছি।

বিমল সত্যই কোথাও যায় নাই। দুপুরের আগেই তাহার দেখা মিলিল। তাহার অনুপস্থিতিতে রন্ধনের আয়োজন আর করি নাই। দেখিলাম সে নিজেই আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। খালাসীদের সহিত ভাব করিয়া একছড়া কলা, একটা বড় তরমুজ ও কয়েকটা পেঁপে জোগাড় করিয়াছে। কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিতে বলিল ভোরের বেলা উঠিয়া সে একদিকের একটা গাধাবোটের উপর গিয়া বসিয়াছিল। ষ্টীমারের তুলনায় সে স্থান যে অত্যন্ত মনোরম তাহাও সে সোৎসাহে জানাইল।

সকাল বেলায় নদীর হাওয়ায় কেমন একটু ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছিল, এখন তেমনি গরম। নীচে বয়লারের ও উপরে সূর্য্যদেবের তাপে সমস্ত ষ্টীমার তাতিয়া আগুন হইয়াছে। শান্ত ঢেউবিহীন বিস্তীর্ণ গঙ্গার জল সূর্য্যের প্রখর আলোয় জলন্ত ইস্পাতের সুপ্রশস্ত পাতের মত দেখাইতেছে। ডেকের যে কোণ হইতে গাধাবোটের ফাঁক দিয়া বাহিরের দৃশ্য একটু দেখা যায় সেই কোণেই দাঁড়াইয়াছিলাম। দুই ধারে ঢালু বন্ধ্যা পাড় দূরের নারিকেল-বনের রেখায় গিয়া মিশিয়াছে।

তাহারই ভিতর কোথাও কোথাও ধানের ক্ষেতের ফালি জলের কিনারা ছুঁইয়াছে, ও যেন জীবন-রস ভিক্ষা করিয়া জাহ্নবীর কোলে শ্যামল ধরণীর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

খালাসীদের প্রাদেশিক ভাষাই এতক্ষণ শুনিয়া আসিতেছি তাহার ভিতর আমাদের দেশের কণ্ঠ কাছে শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। আধা-বয়সী স্থুলকায় এক ভদ্রলোক সেকেণ্ড মেটের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমাদের দেখিযা স্মিতহাস্যে আগাইয়া আসিলেন।

পরিচয় করিয়া জানিলাম তিনিই মালবাবু—দুইটি গাধাবোট তাঁহারই জিম্মায আছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জলপথেই তাঁহার যাতাযাত চলিতেছে, নদীই তাঁহার ঘরবাড়ী। নাম রামপদ জানিলাম।

তিনি হাসিযা বলিলেন 'এ পথে চাষা-ভূষো ছাড়া বড একটা কেউ যায না, আপনাদের দেখে বড আশ্চয্য হলাম'।

বিমল বলিল, 'আমরা যে চাষা-ভূষো নই তাই বা কেমন করে জানলেন?'

রামপদবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'সে কি আর জানতে বাকী থাকে মশাই!'

ভদ্রলোক বড অমায়িক। আমাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ লইযা আপ্যায়িত করিয়া দিলেন। আসিবার সময় চা আনিতে ভুলিযাছি শুনিয়া বিমলকে তাহার ভাণ্ডার হইতে চা আনাইয়া দিবেন বলিয়াও আশ্বাসও দিয়া গেলেন।

সামান্য মালবাবু হইলেও দেখিলাম ষ্টীমারে তাহার প্রতিপত্তি

খুব বেশী। সারেঙ হইতে নিম্নতম খালাসী পর্য্যন্ত তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। তাহার প্রত্যক্ষ কারণ অনেকগুলি। খালাসীদের কাছে শুনিলাম ইংরেজী জানার দরুণ সাহেবদের কাছে তাহাদের হইয়া তিনিই দু'এক কথা বলিয়া থাকেন, সময়ে অসময়ে আবার দরখাস্ত ইত্যাদিও লিখিয়া দেন, দু'চার টাকা ধার দিতেও তাঁহার কৃপণতা নাই।

প্রথম দর্শনে লোকটিকে ভালই লাগিল। রহস্যময় হাসির কথাটা তাঁহাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু কেমন শুনাইবে ভাবিয়া আর পারি নাই।

ষ্টীমারে আমাদের যথেচ্ছ গতিবিধি। সারেঙের সহিত বেশ ভাব হইয়াছে। সন্ধ্যার পর ষ্টীমারের উপরকার অবজারভেশন ব্রীজে গিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম। দিনের অসহ্য গরমের পর সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ঘন মেঘ জমিয়াছে। লোকালয় ফেলিয়া নদী এবার সুন্দরবনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার জল ও সুদূর তীর প্রায় একাকার মনে হয়। শুধু তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ মেঘের আড়ালে পশ্চিমে যেখানে ডুবিতেছে ঘন বনের মাথায় সেখানে নিভু-নিভু আগুনের মত একটু রক্তাভ ছোপ। দিকচক্রবালঘেরা নিস্তব্ধ নদী ও বনের ভিতর আমরাই বোধ হয় কয়েকজন মাত্র মানুষ। চারিধারে আঁধার অরণ্যে প্রাণী-জগতের কি অপরূপ বিচিত্র কাহিনী চলিয়াছে কে জানে। আমাদের ছোট্ট ষ্টীমারের এই কয়টি কাহিনীও কম বিচিত্র নয়। কিন্তু কোথাও কাহারো যোগ নাই।

বিমল একটু অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। খানিক বাদে চাঁদ

একেবারে ডুবিয়া যাইবার পর আমাকে আর কিছু দেখিবার নাই বলিয়া জোর করিয়া নামাইয়া লইয়া আসিল।

নীচে আর যাত্রী নাই। সাধুরা ডায়মণ্ড হারবারে ও কৃষক পরিবার কাকদ্বীপে নামিয়া গিয়াছে।

বিমল বলিল,—'চল মালবাবুর বোটে যাই—তিনি ত চা পাঠালেন না।'

গাধা বোট ও ষ্টীমারের মাঝে সাধারণ সময়ে কোন পার হইবার তক্তা থাকে না। তবু বিমলের অনুরোধ এড়ানো গেল না।

গাধাবোটের উপরে গিয়া স্তূপীকৃত মাল পত্রের মাঝে পথ খুঁজিয়া মালবাবুর কেবিনের কাছে যখন উপস্থিত হইলাম তখন দরজা বন্ধ থাকিলেও ভিতর হইতে আলো দেখা যাইতেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দরজায় ধাক্কা দিয়া কোন সাড়া পাইলাম না। মালবাবুর নাম ধরিয়া আরো জোরে ধাক্কা দিতে অনেকক্ষণ পরে যখন দরজা খুলিল তখন রামপদ বাবুর চেহারা দেখিয়া আমরা ত অবাক। প্রথম আলাপের সময়কার সে প্রসন্নমূর্ত্তি আর তাঁহার নাই। ক্রোধ-বিকৃত-মুখে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ রুক্ষ কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—'এ সময়ে আপনারা এখানে এসেছেন কেন?'

অকস্মাৎ তাঁহার এত রাগের কারণ কি হইতে পারে বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিমল বলিল,—'আপনি রাগ করছেন কেন রামবাবু? সময়টা কি এমন খারাপ।'

গলা আরো চড়াইয়া রামপদবাবু বলিলেন,—'রাগ করছি কেন তার

কৈফিযৎ আপনাকে দিতে হবে নাকি। যাত্রীদেব এখানে আসার অধিকার নেই জানেন।'

বিমল চটিযা গিযা বলিল, 'আপনাব অত মেজাজ দেখাবারই বা কি অধিকার আছে ?

'অধিকার আলবৎ আছে। না বলে কযে আমার বোটে কি জন্যে উঠেছেন ? এটাও কি ষ্টীমার নাকি ?'

'না, এটা লাট সাহেবের অন্দর মহল।' বিমল আরো কিছু বলিত কিন্তু তাহাকে জোর করিযা টানিযা আনিলাম। মালবাবুর বাগটা যতই অস্বাভাবিক হউক না কেন আমরাও যে আমাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিযাছি একথা অস্বীকারেব উপায নাই। এক্ষেত্রে ঝগডা কবিয়া লাভ নাই। বিমলকে সেই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাব বাগ সহজে যাইবাব নয। বলিল, 'মাথাটা ঐখানে গুঁডো কবে দিযে আসাই উচিত ছিল—এমন অভদ্র জানোয়াব ত কখনো দেখিনি। আমবা যেন ওব বোটে চুরি কবতে গেছি।'

সে রাত্রিটা তাহার পব সাধারণভাবেই কাটিল। হাস্যধ্বনির মত কোন কিছু শুনিবাব ক্ষীণ আশা মনেব ভিতর ছিল। কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না।

সমস্ত বহস্যের কতকটা মীমাংসা সকাল বেলা হইল। মাতলার খাঁডিব ভিতর দিযা ষ্টীমার চলিতেছে। চারিধারে অর্দ্ধজলমগ্ন নাতিউচ্চ উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট দ্বীপ। অবজারভেশন ব্রীজ হইতে অদূরে সমুদ্রের বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত মরকতনীলকান্তি দেখা যায। কযেকটা শঙ্খচিল আমাদের ষ্টীমারের অনেকক্ষণ ধরিযা সঙ্গ লইয়াছে। ষ্টীমারের

পিছনে, প্যাড্‌লে আলোড়িত হইয়া যেখানে বিক্ষুব্ধ জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, সেখানেই তাহাদের দৃষ্টি। তাহার উপর বার বার ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহারা মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। বেলা পড়িবার সঙ্গে অনাবৃত ব্রীজে রোদের তাত বেশী লাগায় নীচে আসিয়া একধারের রেলিঙ্‌ ধরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিবার অবশ্য কিছু নাই। সামনে মালবাবুর বোট। অন্যমনে ষ্টীমার ও বোটের মাঝের জলের ব্যবধানটুকুর দিকে চাহিয়াছিলাম। জল বেশ ঘোলা, কিন্তু কোনপ্রকার আবর্জ্জনা নাই। সে জল এত স্থির মনে হয় যে, শুধু সে দিকে চাহিয়া ষ্টীমারের কোন দিকে গতি বুঝিবার উপায় নাই। জলের উপর নিজের মাথার ছায়া দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম ষ্টীমার সোজা পূবমুখে চলিতেছে।

হঠাৎ অবাক হইয়া গেলাম। আমার মাথার ছায়ার কাছে অপর দিক হইতে আর একটি মাথার ছায়া পড়িয়াছে।

সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া দেখিলাম গাধাবোটের স্তূপাকার গাঁটরির একটি ফাঁক হইতে একটি মেয়ে মুখ বাড়াইয়া আমারই মত জলের দিকে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল কিন্তু সেখান হইতে নড়িল না।

এ হাসি চিনিতে দেরী হইল না। দেখিলাম হাস্যধ্বনি হইতে তাহার মুখ সেদিন নিতান্ত ভুল অনুমান করি নাই। মেয়েটির বয়স বছর পনেরো ষোলোর বেশী নয় অবশ্য কিন্তু মুখ চোখ দেখিয়া তাহাও বোঝা সহজ নয়। চোখের দৃষ্টিতে মুখের হাসিতে এমন একটি সারল্য আছে শিশুর মুখেও যাহা বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। হাসিটি অপরূপ হইলেও মেয়েটির মুখখানিতে কেমন একটি রুগ্ন ম্লানিমা

আছে। রুক্ষ চুলের রাশ শীর্ণ মুখটিকে যেন অতিরিক্ত পাণ্ডুরতা দান করিয়াছে।

হাসির শব্দ শুনিয়া বিমলও কাছে আসিযা দাঁড়াইয়াছিল। মেয়েটি তখনও স্মিতমুখে, সরল কৌতূহলী দৃষ্টিতে, আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। এই লজ্জাবোধের অভাব হইতে তাহার সারল্যের স্পষ্টতর প্রমাণ পাইলাম।

তাহার পর কী যে হইল বুঝিতে পারিলাম না। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করিযা হঠাৎ একেবারে পাংশুবর্ণ হইযা মেযেটি মুখ সরাইযা লইল। আশে পাশে চাহিয়া এই আকস্মিক ভয়ের কোন কারণই খুঁজিযা পাইলাম না।

দুপুর বেলা হঠাৎ মালবাবু দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার আবার এক পরিবর্ত্তন হইযাছে। গত রাত্রের ঘটনার জন্য তাঁহার লজ্জা ও অনুশোচনার আর অন্ত নাই। কি বলিযা আমাদের নিকট হইতে তিনি যে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। জীবনভর ঘা খাইযাই মেজাজ তাঁহার বিগড়াইয়া গিয়াছে—একটা মানুষের আর কত সহে। আর ভদ্রতার তিনি জানেনই বা কি। দিন রাত্রি কুলী খালাসীর সঙ্গে মিশিযা তাহাদের সামিল হইয়া গিয়াছেন। কাল ঘুমের ভিতর হঠাৎ জাগিয়া উঠিতে হওযার দরুণই মাথাটা ঠিক ছিল না। আমরা যেন তাঁহার এ অপরাধ মার্জ্জনা করি

এবং মার্জ্জনা যে করিযাছি তাহা প্রমাণ করিবার জন্য রাত্রের আহারটা তাঁহার কেবিনেই সমাধা করি। বিনয়ের এই আতিশয্যে অভিভূত হইয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। রামপদবাবু আরো বার কযেক অনুরোধ করিযা বিদায় লইলেন।

বিমল সমস্তক্ষণ চুপ করিযাছিল। রামপদবাবুর বাক্য-স্রোতের মাঝে দু একটা উত্তর আমিই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার সে আমার দিকে চাহিযা বলিল, 'ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে, দাদা?'

বুঝিতে কিছু পারি নাই। ওই মেযেটির সহিত রামপদবাবুর গত-রাত্রের রাগ ও এদিনের অনুশোচনার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে সে সম্বন্ধ আমার বুদ্ধির এখনো অগোচর। মেযেটির আকস্মিক ভযও আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য।

ষ্টীমারের সেকেণ্ড মেট অত্যন্ত ভাল লোক। বযসকালে সে বারদরিয়ায় অনেক ঘুরিযাছে, এখন আর পারে না। দেশ হইতে দূরে থাকিতে ভালোও লাগে না তাই এই নদীর কাজ লইযাছে। বুড়া প্রথম দিনই আমাদের কাছে একজোড়া ভাল শীতল পাটি অত্যন্ত সস্তায বিক্রী করিবার প্রস্তাব করিযাছিল। এমন খাঁটি জিনিষ আজকাল নাকি পাওযা যায না। পাটি ক্রয করিতে পারি নাই কিন্তু আলাপ জমিযা গিযাছিল।

আজ আবার তাহাকে ধরিয়া বসিলাম। কথায কথায রামবাবুর কেবিনের রহস্যের কথা উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয় সেখানে যে একটি মেয়ে আছে এ কথা বুড়া প্রথমতঃ স্বীকার করিতেই চাহিল না। আমরা নিজের চক্ষে দেখিয়াছি বলার পর খানিক চুপ করিযা থাকিযা

বলিল 'তা হবে বাবু, আমরা জানি না! নিজের কাজকর্ম্ম নিয়েই থাকি, আমাদের ফুরসৎ কই।'

বাধ্য হইয়া শীতলপাটিটা ক্রয় করার প্রস্তাবটা আবার করিলাম। সেকেণ্ড মেট এবার একটু নরম হইল বোধ হয়। কিন্তু শীতলপাটী ক্রয় করিবার প্রস্তাবেও বেশী কিছু সে জানাইতে পারিল না। মালবাবুর স্ত্রী বহুদিন আগে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিল, না গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এমনি একটা কথা সে শুনিয়াছে। এই মেয়েটি মালবাবুরই কন্যা। গত বৎসর হইতে তিনি ইহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছেন। মেয়েটিকে ষ্টীমারেও মালবাবু বাহির হইতে দেন না। ভদ্রলোক কোন আরোহী থাকিলে তাহাকে ত দেখাই যায় না। মেয়েটি খুলনার জেটীতে যেবার ষ্টীমার হইতে লাফ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, মাত্র সেইবার সে ভাল করিয়া মেয়েটিকে দেখিয়াছে। ইহার বেশী কিছু সে জানে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটি পালাতে চেয়েছিল কেন?'

'তা কি জানি বাবু। মালবাবুর নসীব নেহাৎ মন্দ, নইলে একটা মেয়ে, সেও অমন হয়, বলিয়া সেকেণ্ড মেট আবার তাহার পাটির গুণব্যাখ্যা আরম্ভ করিল। তাহার নিকট হইতে আর কিছুই বাহির করা গেল না।

সমুদ্রের দিকে আবার পিছু ফিরিয়া সুন্দরবনের গভীর অংশের ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি। এখানে সঙ্কীর্ণ নদীপথ। একটু এদিক ওদিক হইলেই মনে হয় ষ্টীমার পাড়ে লাগিয়া যাইবে। সূচিভেদ্য অন্ধকারের ভিতর সার্চ্চলাইটের আলো শাণিত তরবারির মত এক পাড়

হইতে অন্য পাড়ে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীর গতিতে ষ্টীমার চলিয়াছে। উপব হইতে সারেঙের আদেশের ঘণ্টা ক্ষণে ক্ষণে বাজিযা উঠিতেছে। দুপাশে দুর্ভেদ্য গরান সুঁদরির জঙ্গল। তাহার উপর সার্চ্চলাইটের আলো পডিবামাত্র মন আপনা হইতেই উদ্‌গ্রীব হইযা উঠে—মনে হয় এই ক্ষণিক আলোয অরণ্যের কি যে ভীষণ বহস্য আমাদের চোখের উপর এখনি উদ্ঘাটিত হইবে। আসলে কিছু তেমন না হইলেও সমস্তক্ষণ গা কেমন ছম ছম করিতে থাকে। অরণ্যের এই গোপন নির্জ্জন প্রদেশে আমরা যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়া ক্ষমাহীন অপরাধ করিযাছি। মনে হয় ষ্টীমারের আওয়াজের ভিতরেও বিশাল অরণ্য-ভূমির কেমন একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশের গুমরানি শোনা যায। সমস্ত দেহ মন তাহাতে অস্পষ্ট আশঙ্কায় আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

আজ বাতে আর লাফাইযা মালবাবুর বোটে উঠিতে হইল না। একজন খালাসী আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। সামান্য গাধাবোটের ভিতরও মালবাবুর ঘরটি দেখিলাম নিতান্ত মন্দ নয়। গৃহের সমস্ত উপকরণই সেখানে আছে।

কাঠের মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল। সেখানেই রামবাবু বসিতে বলিলেন। ঘরের চারিদিকে চাহিযা দেখিতেছিলাম। আমাদের সামনেই একটি দরজা চোখে পড়িল। পাশে আরো একটি ঘর তাহা হইলে আছে। কিন্তু সে ঘরেব দরজাব এদিক হইতে খিল দেওয়া।

রামবাবুকে আজ কেমন যেন বিচলিত মনে হইতেছিল। আহারের যোগাড় নিজেই করিতে করিতে মাঝে মাঝে অসংলগ্ন দু একটি কথা

বলিতেছিলেন। আমাদের মনও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, আলাপ জমিতেছিল না বোধ হয় সেই জন্যই।

বন্ধ দরজার ওধারে কি একটা শব্দ হইল একবার। রামবাবু একটু যেন চমকাইয়া উঠিলেন। আমরাও উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামবাবু হঠাৎ অন্যকথা পাড়িলেন। এখন আমরা যেখান দিয়া চলিযাছি এত গহন জঙ্গল সুন্দর বনে নাকি খুব কম স্থানেই আছে। দিনের বেলা কখন কখন ষ্টীমার হইতেই এখানে বাঘ দেখা গিয়াছে। একবার একটা বাঘ নদী পার হইবার সময় ষ্টীমারের সামনে পড়িয়া কি রকম নাকাল হইযাছিল তাহার গল্পও তিনি করিলেন।

সহজ হইবার চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিতেছিলাম রামবাবুর মন অস্থির হইয়া আছে।

আহার করিতে বসাইয়া রামবাবু প্রথম তাঁহার কন্যার কথা উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, 'আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। মেয়েটার আজ অসুখ, উঠতে পারছে না, নইলে তার হাতের রান্না খেয়ে খুশী হতেন।'

বিমল আসনের উপর হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কথায় চমকাইয়া উঠিলাম। 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন রামবাবু।'

একটি কথায় ঘরের ভিতর কি যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল তাহা বোঝান কঠিন।

রামবাবুর মুখ একেবারে দেখিলাম ছাইএর মত সাদা হইয়া গিয়াছে। অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'মিথ্যে কথা। কেন?'

বিমল দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ মিথ্যে কথা, আপনার মেয়ের অসুখ করেনি।'

রামবাবু মাথা নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। বিমল বলিতে লাগিল, 'আপনার মেয়েকে আপনি ঘরে বন্ধ করে, পায়ে শেকল দিয়ে রেখেছেন। শুধু এখন নয় এ রকম ভাবে শেকল দিয়ে তাকে অনেক সময়েই আপনি রাখেন।'

এবার আমিই প্রতিবাদ করিলাম—'কি বলছ বিমল ?'

'ঠিকই বলছি, কাল থেকেই আমার কি রকম সন্দেহ ছিল। আজ সন্ধ্যায় আমি নিজে গাধাবোটের ধার দিয়ে ঘুরে গোপনে দেখে গেছি। ঘর অন্ধকার হলেও পায়ের শেকল দেখতে আমার ভুল হয়নি।'

রামবাবু এতক্ষণের মধ্যে একবারও মাথা তোলেন নাই। এইবার কাতরভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে চাহিলেন। বিমল তাঁহাকে সুযোগ দিল না।

তীব্র কণ্ঠে সে বলিল, 'আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ তৈরী করবার চেষ্টা করবেন না। আমরা সবই বুঝতে পেরেছি। আপনার মত পিশাচকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ালেও উপযুক্ত শাস্তি হয় না। আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করে আপনার উৎপীড়ন থেকে বেঁচেছে। আপনার অসহায় মেয়ে পালাবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাকেও মার পথ নিতে হবে।'

স্তব্ধ হইয়া বিমলের কথা শুনিতেছিলাম। রামবাবুর বহু রেখাঙ্কিত কাতর মুখের দিকে চাহিয়া সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে সে মুখের পিছনে এত বড় পৈশাচিক মন আত্মগোপন করিয়া আছে।

ভাবিতেছিলাম নিজের স্ত্রী ও নিজের কন্যাকে এ ভাবে যন্ত্রণা দিবার কি হেতু তাহাব থাকিতে পারে। ইহা যদি তাব অহৈতুক বিলাস হয তাহা হইলে সত্যই তাহাব পৈশাচিকতা আমাদেব ধারণার অতীত।

বিমল বলিতেছিল 'এই নির্জ্জন নদীপথে মানুষের দৃষ্টি এড়িযে গোপন থাকাব সুবিধে আপনি অনেকদিন পেযেছেন। কিন্তু এবার আব নিষ্কৃতি নেই জানবেন।'

রামবাবু হঠাৎ উঠিযা দাঁড়াইলেন। দেখিলাম তাঁহার মুখ হইতে পূর্ব্বের সেই গাঢ় ছাযা অনেকটা সবিযা গিযাছে। নিজেকে তিনি যেন ইতিমধ্যে শান্ত কবিযাছেন। এবাব তিনি কি করিবেন বুঝিতে না পাবিযা আমবাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিযা দাঁড়াইলাম। কেবিনেব দেওযাল হইতে বাতিটা পাড়িযা লইযা বদ্ধ দবজার দিকে অগ্রসব হইযা রামবাবু বলিলেন, 'আসুন'।

তাঁহার এই আকস্মিক আচবণে বিমলও কেমন বিমূঢ় হইযা পড়িযা ছিল। আমরা নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম।

দরজা খুলিযা যে ঘবে বামবাবু প্রবেশ কবিলেন আকাবে সেটি অত্যন্ত ছোট। লণ্ঠনের আলোয দেখা গেল, আসবাব পত্র সেখানে কিছুই নাই এবং সত্যই কাঠেব মেঝের একটি শিকলের সহিত বদ্ধ হইযা মেযেটি সেখানে বসিযা আছে।

আমাদের দেখিযাই মেযেটি উচ্চৈস্বরে হাসিযা উঠিল। সেই অপরূপ হাসি। বামবাবু নত হইযা তাহাব শিকলটাই বুঝি খুলিতে গেলেন।

সহসা আমাদের স্তম্ভিত করিয়া মেযেটি তাঁহার হাত কামড়াইয়া

ধরিল। আহত হাত অতি কষ্টে ছাড়াইয়া তাহার শিকল খুলিয়া রামবাবু যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে।

কিন্তু তাঁহার আহত হাতের চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য তখন আমাদের বিহ্বল করিয়া দিয়াছে। শিকল খোলা হইতেই আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া মেয়েটি একদিকের দেওয়ালে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ পর্য্যন্ত তাহার মুখটুকুই দেখিয়াছি। লণ্ঠনের আলোয় তাহার সম্পূর্ণ চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য্য নারীদেহ লইয়া প্রকৃতির ইহার চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস বুঝি আর হইতে পারে না। কোমল এবং প্রায় স্বাভাবিক মুখখানির জন্য বিকলাঙ্গ দেহের বীভৎস ছন্দহীনতা আরো যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম তাহার চোখে সরলতা বলিয়া যাহা ভুল করিয়াছিলাম তাহা মনের মহাশূন্যতার আভাস মাত্র। কণ্ঠের অপরূপ হাসি দিয়া নির্ম্মম বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি-বিভীষিকার উপর ব্যঙ্গের চরম ছাপ রাখিয়াছেন।

বিমল সহসা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর দ্রুত বেগে ঘরের বাহিরে গিয়া তীব্র স্বরে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, 'চলে এস, শীগ্‌গীর চলে এস এ আর দেখা যায় না।'

মেয়েটি শূন্য দৃষ্টিতে তখনো আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া রামবাবু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নিঃশব্দে আমরা আবার আসনে গিয়া বসিলাম।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ ছিল। হঠাৎ ভিতর হইতে মেয়েটি দরজার উপর তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। হঠাৎ সে

আস্ফালন শুনিলে মনে হয় হিংস্র কোন পশুকে বুঝি পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এ তাহারই ক্ষুদ্র আক্রোশের পরিচয়।

রামবাবুর চোখ দেখিলাম অশ্রুসজল হইয়া আসিয়াছে। বলিলেন, 'ওই জন্যেই মাঝে মাঝে শেকল দিয়ে রাখতে হয়। ছাড়া থাকলে এ সময় জলে ঝাঁপ দিয়েও পড়তে পারে।'

মেয়েটি খানিক এই ভাবে আস্ফালন করার পর শ্রান্ত হইয়াই বোধ হয় চুপ করিল। বিমল অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, 'আমায় ক্ষমা করুন রামবাবু।'

রামবাবু বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, 'আপনার দোষ ত' কিছু নেই বিমলবাবু। আপনি একটু ভুল বুঝেছিলেন মাত্র। কিন্তু আমায় সামান্য যে ভর্ৎসনা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী আমার প্রাপ্য। বিধাতার কাছে সেই পাওনা মিলছেও আজ পনেরো বছর।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রামবাবু আবার বলিলেন, 'নিজের সন্তানের এই রূপ দিনের পর দিন দেখার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। সে রেহাই পেয়েছে কিন্তু আমার মুক্তি নেই। সংসারের মাঝে ওকে নিয়ে প্রতিদিন মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে থাকা একেবারে অসহ্য। এই ষ্টীমারে তবু নিজের যন্ত্রণা নিয়ে নির্জ্জনে থাকতে পাই। খালাসীদের কাছে আমার তেমন সঙ্কোচ নেই—তাদের কৌতূহল পরিমিত। তারা অভ্যস্তও হয়ে গেছে। আপনাদের মত আমার সমকক্ষ লোকদেরই আমার ভয়।'

রামবাবু থামিলেন। ভিতরে মেয়েটি আবার অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দরজার বাহির হইতে বার দুই ধমক দিয়া একটু

শান্ত করিয়া আসিয়া রামবাবু আবার তাঁহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সমশ্রেণীর কোন যাত্রী ষ্টীমারে উঠিলে তাঁহার উদ্বেগের সীমা থাকে না। তাহাদের কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে প্রাণপণে তিনি মেয়েটিকে আড়াল রাখিবার চেষ্টা করেন। তাহার দিকে কেহ ঘৃণাভরে তাকাইতেছে একথা ভাবিলে তাহার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইয়া উঠে।

'ও যে আমারি অপরাধের প্রত্যক্ষ শাস্তি তা জানি। কিন্তু নিজের প্রায়শ্চিত্তকে সাধারণের চোখের সামনে প্রকাশ করে রাখার শক্তি আমার নেই।'—রুদ্ধ-গলায় শেষ কথাগুলি বলিয়া রামবাবু দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া চুপ করিলেন।

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম—করুণায় নয়, হতাশায়।

জনহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া তখন ষ্টীমার চলিতেছে। সে অরণ্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু মনে হইল মানুষের মনের অরণ্য রহস্য-বিভীষিকায় তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

পাপ করিতে পারে এত বড় অহঙ্কার ত পশুর নাই।

অর্থ-হীন এ দুর্ব্বল দম্ভ শুধু মানুষের। মনের গহন অন্ধকারে এ দম্ভের নিরর্থক নিদারুণ শাস্তিও তাই তাহার একার।

দুর্লঙ্ঘ্য

বিনয় বাবু আমার কথায় একটু হাসলেন, তারপর সামনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্লেন—তোমার কথাটা একেবারে ভুল নয়। আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা জীবনের স্বরূপ যেন জেনে নিয়েই আসে, তাদের মনে কোন ভ্রান্তি, কোন মরীচিকা-মোহ নেই। কিন্তু তা' বলে ট্র্যাজিডিকে তা'রা এড়িয়ে যেতে পারে মনে কোরো না। আমাদের ছিল স্বপ্নভঙ্গের আকস্মিক আঘাত, আর তোমাদের হচ্ছে, মন্থর অবিরাম প্রাত্যহিক নিরাশার ট্র্যাজিডি। যদি তুলনা করতে চাও তা হলে বলব আমাদেরই ছিল শ্রেয়।

সামনের জানালা দিয়ে বন্ধুর উপত্যকার পারে পাদপহীন পর্ব্বতের রুক্ষ ধূসর রেখা দেখা যাচ্ছে। ওই রেখাটুকুই এখানকার প্রকৃতির কঠোরতাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে তুলেছে। বাড়ির পেছনের দিকে বিশাল খনির উদ্ধত যন্ত্র-দানব আকাশের দিকে আস্ফালন করে উঠে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্যকে কি রকম ভয়াবহ করে তুলেছে তা না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। সে দিকে চাইলেই মনে পড়ে বাঙ্গলার সরস মাটি ছাড়িয়ে অনেক দূরে আমরা প্রবাসী, নইলে ঘরের ভেতর কোন আরামের উপকরণের অভাব নেই। বাঙ্গালীর ঘরের একটি নিজস্ব শ্রীও সেখানে আছে। দেখে কে বুঝবে যে এটি চিরকুমার এক প্রৌঢ়ের দীর্ঘ বিশ বৎসরের আশ্রয়। মনে হয় যেন মেয়েদের হাতের কল্যাণ-চিহ্ন ঘরটির সব জায়গায় পরিস্ফুট।

বন্ধ্যা রুক্ষ মাটির দেশে আমরা দুটি মাত্র বাঙ্গালী, একত্র হয়েছি

জীবিকা অন্বেষণের প্রযোজনে। বিনয বাবু এখানকার ডাক্তার, আমি নিম্নপদস্থ ইঞ্জিনিযার। আমাব সম্বন্ধে জীবিকা অন্বেষণের কথাটা সম্পূর্ণ-ভাবে সত্য কিন্তু বিনয় বাবু সম্বন্ধে সে কথা ঠিক বলা চলে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাব এক এক সমযে মনে হয বিনয় বাবু জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে এই সুদূর স্বজনহীন প্রবাস বেছে নেন নি—বেছে নিযেছেন আত্মগোপনেব প্রযোজনে,—জীবনেব অবিস্মরণীয কোন ঘটনাকে একান্ত গোপন মনে লালন করবাব অভিপ্রাযে।

বিদেশে আমবা দুটি মাত্র বাঙ্গালী, বয়সেব পার্থক্য অনাযাসে ভুলে মিলতে পেবেছি। বিনয় বাবু অতি সহজে আমাব কাছে নিজেকে উন্মুক্ত কবেছেন। বার্দ্ধক্যকে সমীহ করার প্রযোজনে আমায আড়ষ্ট থাকতে হয নি।

বিনয় বাবুকেও নিজেকে আমাব বয়সেব স্তবে নামবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করতে হযেছে তা মনে হয় না। বিনয বাবু বৃদ্ধ হযেছেন খালি বয়সেই—মাথাব চুলের শুভ্রতাই তাঁহার বযসের একমাত্র সাক্ষ্য, নইলে দেহ ও মনে কোথাও তাঁর কোন ভাঁজ পড়েছে বলে বোঝা যায় না।

বন্ধ্যা দেশের শুষ্ক হাওয়াই তাঁকে এমন সজীব বেখেছে কি না কে জানে।

বিনয বাবুব পরিচয দিতে গিযে গল্পের ভূমিকা প্রায কবেই ফেলেছি—এবার আসল ধারায নেমে এলেই হয।

বিনয় বাবুর কথায বল্লাম—আমি ত ওই কথাই বল্‌ছি। আপনাদের

সময়ে মরীচিকা মিলিয়ে যাবার আগে পর্য্যন্ত তবু আপনারা কল্পনার স্বর্গে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পেতেন, আমাদের আগাগোড়াই হতাশা। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের প্রতিদিনই করতে হচ্ছে।

বিনয় বাবু বল্লেন—অবশ্য যাকে জ্ঞানবৃক্ষ বলছ, সে যদি সত্যি জ্ঞান-বৃক্ষ হয়। সৃষ্টিটা দুঃখবাদের উদাহরণ নাও হতে পারে।

আমি একটু হাসলাম, বল্লাম—আপনি নিজের প্রতিবাদ করছেন।

—করছি? তা করছি বটে। এক এক সময়ে করতেও ইচ্ছে করে। জ্ঞান যতই নির্ভুল ও সম্পূর্ণ হোক তাতে সান্ত্বনা ত নেই। তার চেয়ে মরীচিকাও যে ক্ষণিক হলেও ঢের সুখের। এক এক সময়ে নিজেকে প্রবঞ্চনা করার লোভ দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

চুপ করে ছিলাম। বিনয় বাবু আবার বল্লেন—কিন্তু যাই বল আমাদের সে মোহের যুগে পৃথিবীতে রঙ্ ছিল, রেখার বৈচিত্র্য ছিল। তোমরা মোহমুদ্গর দিয়ে সব সমতল করে ফেলেছ—সব এক রঙা। তোমাদের যুগ নিয়ে আর গল্প হয় না।

হেসে বল্লাম—আপনাদের যুগের একটা গল্প শুনি না।

বিনয় বাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন—নেহাৎই শুনবে? বলতে আমার অবশ্য আপত্তি নেই। তবে সেই একঘেয়ে ট্রাজিডি।

—তা ত জানি। তবু বলুন না।

বিনয় বাবু বাইরের দিকে চেয়ে বল্লেন—গল্প এ কালের নয়, এদেশেরও নয়, কিন্তু একালের না হোক, এদেশেরই বুঝি হওয়া উচিত

ছিল। এমনি শুক্‌নো রুক্ষ তার রূপ, কোথাও সরলতা নেই, শুধু কাঠিন্য। তা ছাড়া আমি গুছিয়েও বল্‌তে পারব না বোধ হয়। তবু শোন।

তার পর একটু চুপ করে থেকে বিনয় বাবু আবার আরম্ভ করলেন : সে যুগের কথা খুব সুন্দর নয় কিন্তু তবু তোমরা তার কিছুই জান না। তোমরা সে যুগের কথা বইয়ে পড়েছ ' হয়ত, মনে কর সব তোমরা বোঝ কিন্তু আসলে সে যুগের বাঙ্গলার কিছুই তোমরা জান না। বাঙ্গলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীতে এমন একটা তফাৎ আছে যে আমার এক এক সময় মনে হয় এদুটোর ব্যবধান মাত্র এক সেকেণ্ড নয়—একটা গোটা শতাব্দী।—এই দেখ বৃদ্ধ বয়সের যা দোষ গল্প বল্‌তে বসে সেই বাচালতাই করছি।

তোমাদের কাছে চিন্তার স্বাধীনতা একটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার—এতে তোমরা আশ্চর্য্যও হও না, কোন থ্রিলও পাও না, কিন্তু আমরা তখন সবে মনের খোলসে ঠোকর মেরে একটু আধটু ফুটো করেছি, ঠোকর মারাতেই আমাদের ছিল রোমাঞ্চ ' আমাদের মনে তার নিজস্ব একটা মোহ ছিল ' দোকানে লুকিয়ে চা খেয়েই আমাদের বুক ভরে উঠত গর্ব্বে, ফাউল খেতে পারলে নিজেকে আমরা নেপোলিয়নের সমান মনে করতাম। ধুতির বদলে প্যাণ্ট পরা আমাদের কাছে ছিল দিগ্বিজয়ের সমান। তোমরা এখন এসব শুনে হয়ত হাসবে —কিন্তু সে যুগের আবহাওয়া তোমরা জান না তাই।

পুরুষের বেলায় যখন এই, তখন মেয়েদের ব্যাপারটা বোধ হয় আঁচ করতে পারো। দশের জায়গায় চৌদ্দ পর্য্যন্ত রেখে যে বাপ

মেয়ের বিয়ে দেয়, সে একটা মস্তবড় সংস্কারক। কথামালা ছাড়িয়ে যে মেয়ে ইংরেজী ফাষ্টবুক ধরে তার মর্য্যাদা ও নিন্দার অবধি নেই।

সেই যুগে সূর্য্যকান্ত বলে একটি ছেলে নলিনী বলে একটি মেয়েকে ভাল বেসেছিল।

আমি একটু হাসলাম।

বিনয় বাবু সেটুকু লক্ষ্য করে বল্লেন—আচ্ছা, আচ্ছা, বকলম আর চালাব না। তোমরা এ যুগের ছেলে, সন্দেহ তোমাদের ঘোচান কঠিন। তা ছাড়া সূর্য্যকান্ত নামটাও বড় কটমট। বার বার উচ্চারণ করলে গল্পের রস ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা। কিন্তু নলিনী নামটা থাক্।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আমিই ভালবেসেছিলাম নলিনী বলে একটি মেয়েকে। তের চোদ্দ বছরের মেয়েকে ভালবাসার কথা শুনলে তোমাদের আবার হাসি পাবে হয় ত। কিন্তু আমি তোমায় বল্‌ছি সে যুগে তা সম্ভব ছিল। বঙ্কিম বাবুর রাধারাণীর বয়স কত ছিল জান? প্রথম সংস্করণে বোধ হয় ছিল দশ এগার। পরের সংস্করণে বদলেছিলেন কিন্তু বারোর বেশী বাড়াতে পারেন নি।

যাক্ নলিনী মেয়েটির কথাই বলি। নলিনী সে যুগের মেয়েদের অগ্রবর্ত্তিনী। তার বাবা ব্রাহ্ম না হয়েও ছিলেন—সে যুগে অত্যন্ত অগ্রসর। নলিনী জানলা সাসি বন্ধ করা ছ্যাকরা গাড়ী করে প্রত্যহ মেয়েদের স্কুলে গিয়ে সমস্ত পাড়ার জিহ্বার খোরাক জোগাত।

বল্‌তে পার অবশ্য কি সুযোগ ছিল সে যুগে প্রেমের। কিন্তু প্রেমের জন্যে কতটা সুযোগের দরকার হয়? ওপারে ওরা দেহ-সংলগ্ন

হয়ে নাচবার সুযোগ পেয়েও অক্ষত হৃদয় নিয়ে সারা জীবন কৌমার্য্যে কাটিয়ে দেয়, আবার নদীর জলে চুলের ছায়া দেখেও এককালে রাজপুত্রেরা পাগল হ'য়ে যেত। সে রাজপুত্রেরা রূপকথাতেই বন্দী হয়ে আছে মনে কোরো না।

তাছাড়া নলিনীর সঙ্গে আমার দেখা হবার সুযোগের অভাব কি? বিশেষ করে আমি ছিলুম তাদের জ্ঞাতি এবং সে যুগের সংস্কারকে জয় করে মেডিক্যাল কলেজে মড়া কাটবার বিদ্যে শিখতে সাহস করেছিলাম বলে তার বাবার অত্যন্ত প্রিয়।

আজকের দিনে থিয়েটার বায়স্কোপ, একজিবিশন তোমাদের যে সুযোগ দেয়, আমাদের যুগে তাই দিত বিয়ে-বাড়ি। বিয়ে-বাড়িতে সেকালেও ছিল অবাধ গোপন মিলনের সুযোগ ও স্বাধীনতা। পরিবারে বিবাহ, উপনয়নের মত শুভকর্ম্ম নিত্য হয় না বটে—কিন্তু তা'তে কি আসে যায়—হৃদয় বিনিময়ের পক্ষে একটি মুহূর্ত্তই যথেষ্ট।

না, নীরব প্রেমনিবেদন আমার ছিল না—প্রতিদানহীন বলেও আমার ধারণা নয়।

বিবাহের উৎসবের রাতে পরিত্যক্ত ছাদের অন্ধকার আলসের ধারে আমি এসে দাঁড়িয়েছি—সমস্ত বাড়িতে হাওয়া না পেয়ে নলিনীও উঠে এসেছে অন্যমনস্কভাবে ছাদের ওপর। অন্ধকার এমন কিছু গাঢ় নয় যে কিছু দূরে মানুষ আছে কিনা বোঝা যায় না, তবু বিশ্বাস করতে হবে যে নলিনী আমায় দেখতে না পেয়েই আমার অত্যন্ত কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনকার জম্‌কালো, জরীতে ভারী বেনারসী শাড়ীটি গুছিয়ে প'রে।

আমি সাম্‌নের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলেছি—বাবা! নীচে কি গণ্ডগোল। টেঁকা যায় না!—এবং নলিনী সে স্বরে চমকে উঠে বলেছে—ওমা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! কখন থেকে?

এই ত এলাম—ব'লে আমি সান্নিধ্যের উত্তেজনায় একটু কেঁপে উঠেছি। সদ্য পেটিকামুক্ত বেনারসী শাড়ীর অপূর্ব্ব গন্ধের নেশায় মাথায় আমার ঘোর লেগেছে।

তারপর আর কথা নেই।

নলিনী খানিক বাদে বলেছে—মাগো ওইটুকু মেয়ের কি করে বিয়ে হচ্ছে! আমি হ'লে কক্ষণ বিয়ে করতাম না।

রাঙা টুকটুকে একটী বর হলেও না?

আমার বয়ে গেছে! অমন মাকাল ফল আমার চাই না!

আর এরকম নিষ্ফল হলে!—(অনুপ্রাস দেখে অবাক হয়ো না, দাশুরায় তখন আমাদের মন থেকে মরেনি)।

নলিনী বলেছে—ধ্যেৎ!

লক্ষ্য করলে বোধ হয় যে আমাদের প্রেমের আলাপেও ছিল তখন সে যুগের সংস্কার-উন্মাদনার প্রভাব। তোমাদের যা গা-সওয়া হয়ে গেছে আমরা তখন নতুন স্বাদ পেয়ে জাগরণে নিদ্রাতেও তা ভুলতে পারছি না।

এমনি প্রেমের চিত্র বেশী দেখবার আশা রেখো না—আমি সে আশা মেটাতে পারব না। বেশী পেড়াপীড়ি করলে মিথ্যে বানিয়ে বল্‌তে হবে। বুঝতেই ত পারছ যে তের বছরের মেয়ে আর আঠারো উনিশ বছরের ছেলে তখনকার বাধার ভেতর যা প্রেম করতে পারে, তা' নিয়ে

চমকপ্রদ তেমন কোন পূর্ব্বরাগের ছবি তৈরী হতে পারে না, যাতে বুদ্ধিদীপ্ত বাণী করবে ঝলমল, ভাবাবেগের সমুদ্র উঠবে দুলে। তের বছরের মেয়ে কটা কথাই বা জানে? আর যা জানে, তার কটাই বা বলতে পারে গুছিয়ে। তোমায় ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে হবে।

কিন্তু তাই বলে প্রেম আমাদের কিছু কম গভীর মনে করো না, মৌন হ'লেও সে অতল।

আমি তখন ভবিষ্যতের কি সব অপরূপ স্বপ্নই দেখছি নলিনীকে কেন্দ্র করে! স্বপ্নই বা তাকে বলি কেন! ভাগ্যকে তখন আমি মনে মনে ভাবী জীবনের ফরমাজ দিয়ে ফেলেছি, সে ফরমাজ যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে সে সম্বন্ধে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। আগামী যুগের আমরা অগ্রদূত—প্রগতির বার্ত্তা বহন করে চলব এগিয়ে। পৃথিবী তখন আমাদের কেন্দ্র করেই আবর্ত্তিত হ'তে সুরু করেছে।

নলিনী কি স্বপ্ন দেখেছিল সেই জানে, কিন্তু আমার থেকে বিশেষ তার তফাৎ ছিল বলে মনে হয় না।

এইবার গল্পকে আমি তিন চারটে বছরের উপর দিয়ে চোখ-কাণ-বুজে টেনে নিয়ে যাব। এখানে রইল তোমার কল্পনার অবসর। তুমি ইচ্ছামত বিবরণে এটি ভরিয়ে নিতে পারো। শুধু মনে রেখো, মরা মানুষের বুকের সমস্ত তথ্য জেনেও জীবিত মানুষের হৃদয় সম্বন্ধে আমি হতাশ হইনি এবং নলিনীও তার পাঠ্য পুস্তকে সৃষ্টির মূলে বিষ আছে এমন কোন তথ্য পায়নি। আমরা পরস্পরের আরো কাছে ঘেঁসে এসেছি এবং স্বপ্ন আমাদের তখন বর্ণবাহুল্যে আরো ঘোরালো হয়ে এসেছে।

এমন সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় আমি হলাম সসম্মানে উত্তীর্ণ এবং সুদূর পশ্চিমে মোটা মাইনের এমন একটা চাকরীর সুযোগ পেলাম, যা ইতিপূর্ব্বে নাকি কোন নেটিভের ভাগ্যে জোটেনি। নলিনীর বাবাই উৎসাহ দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলেন। বাঙ্গালীর নাকি, এমনি দুঃসাহসী হবারই বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রেম ও কর্ত্তব্য দুইএর মাঝে পড়ে কর্ত্তব্যের টানে ও নলিনীর বাবার উৎসাহে আমি চলে গেলাম এমন সুদূর এক জায়গায়, যেখানে সে সময়ে বৃথা অপব্যয়ের আশঙ্কায় লোকে চিঠি পাঠাতে পর্য্যন্ত সাহস করত না।

গল্প অত্যন্ত মামুলী প্রণালীতে চলেছে কিন্তু সে আমার দোষ নয়।

সে সুদূর প্রবাস থেকে চেষ্টা চরিত্র করেও বছর দুয়েকের আগে আমি ফিরতে পারলাম না। কিন্তু ফিরতে না পারলেও মনে আমার কোন আশঙ্কা ছিল না। নলিনীর বাবার সাহস ও মানসিক সবলতায় আমার ছিল অটুট বিশ্বাস। আর যেই টলুক—মানুষের জিহ্বা সঞ্চালনে তিনি যে টলবেন না এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হায় মানুষের মন!

দু'বছর বাদে ফিরে এসে দেখলাম দুনিয়ায় অপ্রত্যাশিত সব পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। পৃথিবী হঠাৎ আমাকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করে সূর্য্যকেই করছে প্রদক্ষিণ, পল বিপল হিসেব করে। কাল আমার জন্যে অপেক্ষা করেনি, নলিনীর বাবাও না। জ্ঞাতি কুটুম্বের ভর্ৎসনায় অতিষ্ঠ হয়ে নলিনীর তিনি বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আঘাত এইখানে নয়—আঘাত এই যে, নলিনী এক বৎসরের মধ্যে ফিরেছে বিধবা হয়ে।

মামুলি হোক, সেকেলে হোক গল্প এইবার জমকালো হ'য়ে আরম্ভ হ'ল ভেবে তুমি বোধ হয উল্লসিত হযে উঠছ। কিন্তু ভুল করলে, গল্প এবার প্রায শেষ হযে এল। নলিনীর বাবার সংস্কারক-সত্তা আবার প্রবলভাবে জাগ্রত হওযা সত্ত্বেও গল্প এল শেষ হযে।

একান্ত আদরের মেযের অশ্রুমোচনের সঙ্গে সমাজের গোঁড়ামির মূলে আঘাত দেবার জন্যে নলিনীর বাবা উঠলেন মেতে, ভালবাসার পাত্রীকে ফিরে পাওযার সঙ্গে উদারতাব এতবড কীর্ত্তি রাখবার সম্ভাবনায় আমার মন আনন্দে উঠল নেচে। কিন্তু নলিনী সেই যে ঘাড বেঁকিযে দাঁডাল সে ঘাড আর সোজা করা গেলো না।

বিয়ে, দু'বার বিযে—কারুর হ'তে পারে না, না পুরুষ না মেযের, এই তার মত।

সে যুগে যা অসম্ভব, নলিনীর বাপ সে সুযোগও আমায় দিলেন। নলিনীর সঙ্গে দেখা করে, বুঝিয়ে বলার সুযোগ আমি পেলাম।

না, স্বামীর পাদুকা সামনে রেখে সে পূজোয় বসে ছিল না—তা হলে বুঝি কিছু আশা থাকত। তার বদলে তার মুখে দেখলাম অপরূপ সঙ্কল্পের দৃঢতা, চোখে প্রেমের গভীর তন্ময়তা। যেন তার কাছে এপার-ওপারের যবনিকা গেছে সরে। প্রেমাস্পদের বিরহ সে জানে না।

ব্যথাও যেমন পেলাম, তেমনি পেলাম লজ্জা—হাঁ লজ্জা, আমার সমস্ত কথা গেল ম্লান হয়ে মনের মধ্যে মিলিযে। কোন মতে সাধারণ দুটো আলাপ করে বেরিযে এলাম।

বুঝলাম তেরো বছরের যে কিশোরীটার সঙ্গে আমি প্রেমের ছেলে-খেলা করেছিলাম, সে কোথায গেছে হারিয়ে। পূর্ণযৌবনা নলিনীর

মন সত্যকার আর এক প্রেমের অমৃত-স্বাদ পেয়ে মধুময় হয়ে আছে। সে-মনে আমার স্থান নেই।

বিনয় বাবু থামলেন।

আমি হতাশ হয়ে বল্‌লাম—এই! এই আপনার ট্র্যাজিডি!

ম্লান হেসে বিনয় বাবু বল্‌লেন—অত অধীর হলে চলবে কেন? গল্প শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু এই খানেই নয়।

দেশ থেকে এবার বিদায় নিলাম দীর্ঘ দিনের জন্য—চিরদিনের জন্যেই ইচ্ছে ছিল কিন্তু হয়ে উঠ্‌ল না। বছর পনেরো পরে আবার ফির্‌লাম। সে বেশী দিনের কথা নয়। কলকাতার রাস্তায় মৃগাঙ্কের সঙ্গে দেখা। ঠিকানা দিয়ে বল্লে, আমরা এখানে আছি। এক দিন আসুন না।

মৃগাঙ্ক নলিনীর ছোট ভাই।

কোন আশা নিয়ে নয়, অমনিই গেলাম একদিন। আহিরীটোলার গঙ্গার ধারে ছোট একটা বাড়ী ভাড়া করে তা'রা আছে। দরজায় গিয়ে মৃগাঙ্কের নাম ধরে ডাকাডাকি কর্‌ছি, পেছন থেকে শুনলাম—একটু পাশ দেবেন ত!

গঙ্গায় স্নান করে ভিজে কাপড়ে একটি শীর্ণ চেহারার মহিলা পেছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতেই, ভিজে কাপড় নিংড়ে সামনে জলের ছিটে দিতে দিতে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

তুমি শুনেই চিন্‌তে পেরেছ নিশ্চয় কিন্তু প্রথমটা আমি পারিনি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, খাটো কাপড়ে শরীরের অতি কষ্টে লজ্জা

নিবারণ হযেছে—তার উপর সমস্ত মুখে চোখে অকাল প্রৌঢ়ত্বের এমন একটা ছাপ পড়েছে যে নলিনীকে চেনা কঠিন। চিন্‌লাম আমি শুধু তার চলার ভঙ্গি দেখে।

আমি চিন্‌লেও নলিনী যে চেনেনি একথা ঠিক। কারণ আমি নলিনী বলে ডাকলেও সে পেছন ফিরে' খানিক বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বল্লাম—চিন্‌তে পারছ না।

ওঃ—বিনুদা।—বিশেষ কিছু উল্লাস থাকবার কথা নয় সে স্বরে—আমি তা আশাও করিনি।

বল্লাম—মৃগাঙ্কের সঙ্গে সেদিন রাস্তায় দেখা। বলেছিল, তাই দেখা করতে এলাম। বাড়িতে আছে সে ?

আছে বোধ হয। এস না তুমি ভিতরে।

নলিনী এগিযে চল্ল—আমি তার পিছু নিলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম এযাবৎ সে প্রত্যেকবার পা ফেলবার আগে ভিজে কাপড় নিংড়ে গঙ্গাজল সামনে ছিটোতে ছিটোতে চলেছে।

বাইরের দরজা থেকে একটা লম্বা গলির মত রাস্তা পার হযে নলিনীদের বাড়ীর ভিতর ঢুকতে হয়। গলিটা থাকার দরুণই নলিনীর এ আচরণ আমার চোখে পড়ল। দেখলাম এক একবার সে পিছনে ফিরে সন্ত্রস্ত ভাবে তাকাচ্ছে।

প্রথমটা মানে বুঝতে পারিনি, কিন্তু গলি-পথ শেষ হবার আগেই সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভেতরের দরজার কাছাকাছি এসে নলিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে

পড়ল, একটু ইতস্ততঃ করে কুণ্ঠিতভাবে বল্লে,—তুমি, তুমি ভেতরে যাও। আমি একটু আসছি।

আবার কোথায় যাবে ?

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে নলিনী বল্লে,—কি একটা যেন মাড়ালাম, আর একটা ডুব দিয়ে আস্‌ছি।

তার পায়ের দিকে তাকিয়ে বল্লাম—কিছুত মাড়াও নি। ওটা একটা কাঠি।

তেমনি কুণ্ঠিত ভাবে সে বল্লে—কি এঁটো কাঁটা হবে। আমি,—আমি যাই। তুমি যাও না, মৃগাঙ্ক আছে।

তার মুখের দিকে এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম। কোথায় গেছে সে প্রেমের আনন্দের জ্যোতি, কোথায় সে তপস্যার কাঠিন্য। সমস্ত মুখে অকাল বার্দ্ধক্যের ছাপ, চোখের কোণে অধরের দুপাশে ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতার গভীর রেখা। কে বলবে এই সেই তেজস্বিনী নারী, যা'কে দেখে একদিন মনে হয়েছিল যে ভালবাসার মহিমায় জীবন মৃত্যুর যবনিকাও এর কাছে সরে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কুণ্ঠিত পদে নলিনী আবার ফিরে গেল গঙ্গার দিকে।

মৃগাঙ্ক এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, আমায় ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বল্লে—দিদি আবার গঙ্গায় ডুব দিতে গেল ত। সকাল থেকে এই চারবার, এখনো সমস্ত দিন আছে। জ্বালিয়ে খেলে বাবা।

আমাকে ভাল করে বোঝাবার জন্যেই তারপর সে আবার বল্লে,—এর কোন ব্যবস্থা আছে বল্‌তে পারেন ? ওই ত দেখুন না ঘর, ভেতরে

পচে যাচ্ছে তবু দরজা, জানালা খুলবে না! বাইরে থেকে যদি নোংরা জলের ছিটে যায় ঘরের ভেতর! এত করেও তবু কিন্তু সন্দেহ যায় না! আধঘণ্টা অন্তর গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিয়ে আসছে। সারাদিন এই ছুঁলে, সেই ছিটে লাগল এ ছাড়া কোনো চিন্তা নেই। একেবারে জ্বালাতন হয়ে গেলাম!

নলিনীদের বাড়ী তারপর আর যাইনি।

বিনয় বাবু এবার চুপ করলেন।

বল্লাম—আপনি যে শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারী শাস্ত্রই এনে ফেল্লেন!

বিনয় বাবু ম্লান হেসে বল্লেন—ট্র্যাজিডি ত সেই খানেই! অপরূপ, রহস্যময় এই মানব-আত্মা, শূন্য আকাশ যে দেবতায় ভরিয়ে তোলে, প্রেমকে মৃত্যুর ওপারেও জয়ী করবার যে স্পর্দ্ধা করে শেষ পর্য্যন্ত সেও একটা শুকনো, কুৎসিৎ ডাক্তারী শাস্ত্রের অধীন। ডাক্তারী শাস্ত্রের অমোঘ বিধান তার সমস্ত আদর্শ, সমস্ত স্বপ্নকে নির্ম্মমভাবে গুঁড়িয়ে থেঁৎলে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলে যায়।

এটা কি ঠিক সেকালের ট্র্যাজিডি হ'ল?—জিজ্ঞাসা করলাম।

বিনয় বাবু বল্লেন—হাঁ, সেকালের ট্র্যাজিডি, একালের দৃষ্টিতে দেখা।

মুহূর্ত্ত

খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখে শশাঙ্কর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেও প্রথমটা তার বুকেব দ্রুত স্পন্দন যেন থামতে চায না। স্বপ্নের সে বিভীষিকা এখনও যেন চারধারের অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। গলাটা তার শুকিয়ে গেছলো তবু শশাঙ্কর কেমন যেন উঠে জল গড়িযে খেতে ইচ্ছে হলনা। স্বপ্নের বিভীষিকা ত্যকে যেন শিশুর মত অসহায করে ফেলেছে। অন্ধকারে নিজেকে তার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অত্যন্ত দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছিল। এই ভয়াবহ একাকীত্ব সে যেন কিছুতেই সহ্য কবতে পারবে না। চুপ করে খানিক শুয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে অন্ধকারে পাশে হাত বাডাল। হাতে ঠেকল মালতীর চুল। এইবার তার নিদ্রার ঘোর ও স্বপ্নের বিভীষিকা কেটে যাচ্ছে অনেকটা। মালতীর মৃদু নিশ্বাসের শব্দ নিস্তব্ধ অন্ধকারে সে শুনতে পেল। সে শব্দেও যেন একটু আশ্বাস আছে। সেই নিশ্বাসের মৃদু শব্দটিতে যেন মালতীরও আর একটি পরিচয আছে। হাতটা আরেকটু নামিয়ে শশাঙ্ক মালতীর গালের ওপর এবার রাখলে। অপরূপ স্নিগ্ধ কোমলতা। সমস্ত মন জুড়িয়ে যায। সমস্ত দেহ প্রথম মেঘেব ছোঁযালাগা গ্রীষ্মের আকাশের মত নরম হযে আসে। এই কোমলতা এই স্নিগ্ধতা সে মালতীর সমস্ত সত্তার কাছেই ত' প্রত্যাশা কবেছিল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয়েছে কি? নিদ্রিত মালতীর এই রূপের সঙ্গে জাগ্রত মালতীর যে অনেক তফাৎ।

ম্যলতীর কাঁধের ওপর হাত রেখে শশাঙ্ক তাকে আস্তে একটু

'নজের দিকে আকর্ষণ করলে। ঘুমের ভিতরই মালতী তার দিকে আব একটু সরে এসে একটি হাত রাখলে তার গলার ওপর। মালতীর মুখটি এবার একেবারে শশাঙ্কর বুকের কাছে। মালতীব শরীরেব উত্তাপ এবার সে অনুভব করতে পারছে। মালতীর চুলের ঘ্রাণ সে পাচ্ছে। শশাঙ্কর মনে হল এমন কাছাকাছি তারা অনেকদিন আসেনি। না এসেছে বটে—কিন্তু শীগ্গীর অত্যন্ত অল্প সময়েব মধ্যেই এই নিশ্চিন্ত আত্মনিমজ্জনের সুর গেছে কেটে।

কেন যে কেটে গেছে শশাঙ্ক ভাল বুঝতে পারে না। ঠিক যে ঝগড়া তারা করে তা নয, বাইরে থেকে তাদেব জীবনে পরস্পবেব প্রতি বিরূপ হবাব কোন কারণ আছে বলেও শশাঙ্কব মনে হয না। তবু কেমন যেন তারা মিলতে পারছে না সম্পূর্ণ ভাবে। কোথায তাদেব অবচেতন মনে বযেছে একটা আশঙ্কা, এমন কি একটা আক্রোশও বলা যেতে পারে পরস্পবেব বিরুদ্ধে। শশাঙ্কর না থাক মালতীর আছে নিশ্চয়।

মালতী কিছুতেই তার কাছে সম্পূর্ণভাবে ধরা যেন দিতে চায না কিম্বা পাবে না। মালতী তার কাছে রইল অৰ্দ্ধমুদিত হযে, নিজেব সমস্ত পাপড়ি সে খুললে না। অদৃশ্য কাঁটার ব্যবধান দিযে শশাঙ্ককে সে সব সময়েই একটু দূরে রেখে দিলে।

কিন্তু নিস্তব্ধ রাতেব এই স্নিগ্ধ মালতীকে শশাঙ্কর যে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যৌবন যাবার আগেই যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত বিশ্বাস যাদের ভেঙ্গে যায় শশাঙ্ক সেই হতভাগ্যদের একজন। ঘা খেযে খেয়ে সে তার আশাকে সঙ্কীর্ণ করে এনেছিল, সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে সে একটিমাত্র সান্ত্বনার ওপর ভর করতে চেযেছিল। সে

সান্ত্বনা প্রেমের। সমস্ত দুঃখ হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের মাঝে হৃদয়ের এই নিবদ্ধ কুলায়ে সে শান্তি পাবে ভেবেছিল। কিন্তু মালতী কিছুতেই তেমন করে কাছে এলনা, কিছুতেই উন্মুক্ত করলে না নিজেকে।

বাইরে থেকে দেখলে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোন চিড চোখে পড়বে না বোধ হয়। বেশ মসৃণভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। মালতীর কোন দোষ কোন ত্রুটি নেই। গৃহলক্ষ্মী হিসাবে সে আদর্শ। সংসারের তত্ত্বাবধান সে এমন নিখুঁতভাবে করে যে শশাঙ্ককে কোন দায়ই পোহাতে হয় না। নিঃশব্দে ঘুরে চলে দিনের চাকা।

ঘর দোর পরিপাটীভাবে সাজান। শশাঙ্ক না চাইতে তার প্রয়োজনের জিনিষ যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হবেই। তার লেখার টেবিলের ওপর ব্লটিংকাগজ প্রতিদিন সকালে নিষ্কলঙ্কভাবে দেখা দেয়। ফাউণ্টেন পেনটি যেখানেই ফেলে রাখুক না কেন প্রয়োজনের সময় দেখা যায়, টেবিলের ওপর সেটি নতমুখে মসীপূর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। টেব্‌লল্যাম্পের শেড্‌টি প্রতিদিন রাত্রে সেই প্রথম দিনের মত ঝক্‌ ঝক্‌ করে। মালতীর আয়োজন নিখুঁত নির্ভুল। কিন্তু এ আয়োজন আনন্দময় সেবার নয়, পূজারও নয়, এ আয়োজন নীরস কর্ত্তব্যের।

এই কঠিন কর্ত্তব্যপরায়ণতাই মালতীর চারিধারে দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত। সেই বর্ম্ম অতিক্রম করে মালতীর নাগাল আর কিছুতেই পাওয়া যায়না। সকালে উঠে হয়ত শশাঙ্ককে বেরুতে হবে। দেরাজ খুলে মোজা বার করতে গিয়ে মোজা সে পায়না। কিন্তু হেঁকে কিছু বলবার আগেই মালতীকে মোজা হাতে করে ঢুকতে দেখা যায়। শশাঙ্কর দিকে না

চেয়েই সে বলে,—গোড়ালির কাছটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছে। একটু দাঁড়াও সেলাই করে দিচ্ছি।

শশাঙ্ক বলে,—ওইটুকু ছেঁড়ায় কিছু হবে না, কাল বরং সেলাই কোরো'খন।

মালতী একটা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে সেলাই করতে করতে বলে,—দেরী হবেনা এখুনি দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি সেলাই করতে গিয়ে স্থঁচটা অসাবধানে বুঝি আঙুলে ফুটে যায়। শশাঙ্ক ব্যস্ত হয়ে উঠে বলে,—ওকি আঙুল দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে যে।

শশাঙ্কর সমবেদনাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে সহজস্বরে মালতী বলে,—ও কিছু নয়। মোজাটা এবার সে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে।

শশাঙ্ক তবু নিরস্ত হয়না। ক্ষত আঙুলটা ধরে বলে,—সামান্য একটু কাটা থেকে অনেক কিছু হতে পারে তা জান।

আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মালতী বলে,—আচ্ছা একটু আয়োডিন লাগিয়ে দিচ্ছি।

ব্যস্ এরপর আর কোন কথা চলেনা। মালতীর দুর্ভেদ্য বর্ম্মের ভেতর সূক্ষ্মসূচিমুখেও প্রবেশের সুযোগ নেই।

মালতী সব অবস্থাতেই এমনই সুন্দর এমনই অনধিগম্য চিরকাল। দরিদ্র শ্বশুরকে নিজের মহানুভবতায় কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে যেদিন সে মালতীকে ঘরে এনেছিল তখন কতই বা তার বয়স হবে,—বড জোর ষোল কি সতেরো। কিন্তু মালতীর চারিধারে তখন থেকেই

এই তুষার প্রাচীর ছিল দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে। মালতী অবশ্য আঘাত দিয়ে শশাঙ্কব অগ্রসর হবার চেষ্টাকে প্রতিহত করে নি কিন্তু তাব তুষার শীতল স্থৈর্য্যের কাছে এসে শশাঙ্কর সমস্ত আবেগের উত্তাপ গিয়েছে সঙ্কোচে জুড়িয়ে।

শশাঙ্ক আদর করলে মালতী রাগ কবে না, বাধা দেয না কিন্তু কি এক অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে অদৃশ্য এক খেয়ালের মধ্যে গোপন কবে ফেলে। শশাঙ্ক বুঝতে পারে তাব কোন আবেদন সে খোলস ভেদ করে ভেতরে পৌছেচ্ছে না। হতাশ হযে সে নিজেকে সংযত করে তাই। কিন্তু মালতী আঘাত না দিলেও এ আত্মদমনের আঘাত একটা আছে। শশাঙ্কেব আত্মা পর্য্যন্ত সে আঘাতে যেন জর্জ্জর হযে উঠেছে।

শশাঙ্কের মন ইতবতার অনেক উর্দ্ধে, তবু মালতীব এই শীতলতার কারণ অনুসন্ধান কবতে গিয়ে অত্যন্ত কুৎসিত কযেকটা দিনের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। জঘন্য সন্দেহেব গ্লানিতে কুৎসিত সে দিন-গুলির কথা মনে হলেও শশাঙ্কর আজকাল ভয হয। নিজেব অনিচ্ছায নিজেব সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিন সে পশুর মত হিংস্র হয়ে উঠেছিল। মনে হযেছিল মালতী তাকে ভালবাসেনা বলেই হয়ত ধরা দেয় না। আর মালতী যদি তাকে ভাল না বাসে তবে কি—। নিজের মনেব কাছে অনুচ্চারিত সেই প্রশ্ন সেদিন তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল। এ প্রশ্নকে সে আমল দিতে চাযনি তবু ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মত একটি নাতিস্ফুট জ্বালাময উত্তর তার মনকে ঝলসে দিয়ে গেছে বহ্নি-বিষে। সেদিন কত নীচেই যে সে নেমে গিয়েছিল মনে হলেও তার এখনও লজ্জা হয়। মালতীর অসাক্ষাতে একদিন সে চোরের মত তার বাক্স

খুলে ওলটপালট করে দেখেছে। কিছু পায়নি অবশ্য। কিন্তু না পেয়েও যেন সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বাক্স বন্ধ করে রাখবার আগেই মালতী এসে ঘরে ঢুকেছিল। শশাঙ্ক অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল—আমার কামাবার ছোট আয়নাটা পাচ্ছিনা, তোমার বাক্সে রেখেছ কি না দেখছিলাম।

মালতী সহজ স্বরে বলেছিল—আয়না ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই আছে। সে স্বরে ভর্ৎসনা নেই, বিস্ময়ও নেই। শশাঙ্ক মুখ চোখ লাল করে ঘব থেকে বেরিয়ে গেছল।

আব একদিন সে দুপুরবেলা হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিল অত্যন্ত অস্থির ভাবে। কি তার মনে ছিল কে জানে কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে মালতীর সামনে বোধ হয় সে তার সঙ্কল্প স্থির বাখতে পারেনি।

মালতী তখন তার ঘর গুছোচ্ছে। শশাঙ্ক একটু কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল—এ ছবি নামানো হয়েছে যে বড ?

মালতী একটু বুঝি চুপ করে থেকে শশাঙ্কের দিকে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে বলেছিল—নামালে কি হয় ?

এমনভাবে বাহুল্য-প্রশ্ন করে কথা বাডানো মালতীর স্বভাব নয। তার গলার স্বরেও বুঝি অস্বাভাবিক একটু উত্তেজনার রেশ ছিল। শশাঙ্ক একটু বিস্মিত হ'ল। কিন্তু মালতী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লে—ধূলো পডছিল, ভাল করে মুছে তুলে রাখবো বলে নামিয়েছি।

শশাঙ্কের মন অনেকটা এবার গলে গেল। এ ছবি তার প্রথমা স্ত্রীর। বিয়ের পরই প্রথম দিন মালতীকে নিয়ে এ ঘরে ঢুকে এই ছবিটি দেখিয়ে শশাঙ্ক বলেছিল—কে জান মালতী ?

মালতী খানিক একদৃষ্টে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—জানি।

এ ঘরে ওর অপমান যেন কখন না হয় মালতী। কোন দিন যেন আমরা মনে না করি ও শুধু একটা ছবি।

মালতী এবারেও খানিক মাথা নীচু করে থেকে ঘাড নেড়ে জানিয়েছিল সে তা করবে না।

মালতী তার অসাক্ষাতেও এ ছবির যত্ন করে জেনে সত্যিই শশাঙ্ক খুসী হ'ল। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ে সে উৎসাহ ভরে বল্লে—কাজ করতে করতে হঠাৎ পালিয়ে এলাম, জান মালতী!

কিন্তু মালতীর মুখে সে উৎসাহ প্রতিফলিত হবার আশা বৃথা। সে সাধারণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে,—আবার এখুনি যাবে নাকি?

এ উত্তর শশাঙ্ক আশা করেনি, তারপর আবার কঠিন হয়ে উঠে হঠাৎ সে উগ্র স্বরে বল্লে,—আমি গেলেই তুমি বাঁচ, না?

মালতী তার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—তা'ত বলিনি।

বলনি, আবার কি করে তাহলে বলতে হয়?

মালতী এবার নীরব।

শশাঙ্ক আবার বল্লে,—আমি যদি তোমার কাছে এমন বিষই হয়ে থাকি, তা হলে কি দরকার আমার কাছে তোমার থাকবার?

কি ইতর ভাবেই সে ঝগড়া করছে বুঝতে পেরে শশাঙ্ক যেন আরো মরিয়া হয়ে উঠল। হিংস্র ভাবে মালতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—তোমার এখানে থাকতে ভাল লাগেনা কেমন? চল আজই তোমায় দিয়ে আসছি।

মালতী মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। তাব সমস্ত মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে। মনে হল তার স্বাভাবিক স্থৈর্য্য বুঝি আর থাকবে না। তার অবিচলতার মুখোস বুঝি ভেঙ্গে পড়ে আবেগের ভবে। কিন্তু মালতী এবারেও জয়ী হল। অসামান্য শক্তিতে নিজেকে দমন কবে সে হঠাৎ মুখ তুলে দৃঢস্বরে বল্লে—আমি এখান থেকে যাব না।

নিজের ব্যবহাবে এবাব শশাঙ্ক লজ্জিত হযে উঠল মনে মনে। ঘরের ভেতর এবকম ভাবে মালতীব সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তার অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল। সে ঘব থেকে বেরিয়ে গেল।

সে কুৎসিৎ দিনগুলির ছাযা তাবপব শশাঙ্কের মন থেকে সবে গেছে কিন্তু দুজনকার ভেতবকাব সম্বন্ধ সহজ হযনি আজো। মালতীকে সে পেল না পাশাপাশি শুয়েও তারা বইল একান্ত অপরিচিত হযে।

অন্ধকারে অর্থহীন ভাবে শশাঙ্ক চেয়েছিল। দেযাল ঘড়িটার কাঁটা এগিযে চলেছে অশ্রান্ত ভাবে—টকাটক্। সমস্ত অন্ধকাব সে শব্দে ভবে গেছে। সেই শব্দটা এবাব অদ্ভুতভাবে শশাঙ্ককে অভিভূত কবে দিল। টকাটক্—টকাটক্—বিবাম-বিহীন শ্রান্তিবিহীন পায়েব শব্দ। অসীম অনন্ত সমযেব অন্ধকাব মরুপ্রান্তর বেযে যেন চলেছে অনন্ত কালেব অক্লান্ত প্রহরী। তারই অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে নিয়মিত তালে তালে। এ চলার বিরাম নেই, এ যাত্রার শেষ নাই। কল্পনা যেখানে পৌছে না সেই অতীত থেকে ধারণার অতীত ভবিষ্যতে এই পথ। ভাবতেও ভয়ঙ্কর লাগে। এ বিশাল অনন্ত সমযের মরুতে কতটুকু পথ শশাঙ্কের? কালের সওযার নিমেষে তার সে আযুর পথ পার হযে যাবে। তারপর এমনি অন্ধকার আর শূন্যতা। এই নশ্বর আয়ুর কি

স্বার্থকতা আছে একমাত্র প্রেমে ছাড়া। এ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা ভিতরের রঙে অন্ধকারকে ক্ষণিকের জন্য রঞ্জিত করে তোলায়। কিন্তু শশাঙ্কের সে সান্ত্বনাও নেই। একবার মৃত্যু তাকে ব্যঙ্গ করে গেছে, এবার জীবন আছে তার সামনে দুর্বহ বোধ করে।

হঠাৎ শশাঙ্ক চমকে উঠল। জানলার পাল্লাটা কে যেন সশব্দে নেড়ে দিয়েছে। সেটা ঝণ ঝণ করে নড়ে উঠছে। শশাঙ্ক কৌতূহলী হয়ে উঠে যাবার আগেই সমস্ত ঘরটা যেন দুলে উঠল। দরজা নড়ছে, খাট দুলছে, আলমারীব জিনিষপত্র দেয়ালের ছবিগুলো সব উঠেছে অস্থির ভাবে কেঁপে। চকিতে ব্যাপাবটাব অর্থ বুঝতে পেবে শশাঙ্ক ভীত হয়ে উঠল। সজোরে মালতীকে নাড়া দিয়ে ডাকলে—ওঠ ওঠ মালতী শীগগীর ওঠ।

ঘর তখন রীতিমত দুলতে স্থরু করেছে, ছিটকিনি খুলে গিয়ে জানলার পাল্লাগুলো আছাড় খাচ্ছে গবাদের ওপর, ওপরের একটা তাক থেকে কাচের কটা বাসন সশব্দে নীচে পড়ে ভেঙ্গে গেল। সে শব্দে ও শশাঙ্কেব ডাকে ধড়মড় করে উঠে পড়ে মালতী নির্ব্বোধ ভয়ে শশাঙ্ককে ধরলে জড়িয়ে।

ভূকম্প হচ্ছে মালতী শীগ্‌গীর ওঠ।

শশাঙ্ক কোন রকমে মালতীকে সঙ্গে করে উঠে স্থইচটা টিপে দিলে। অন্ধকারে শব্দটা পাওয়া যাচ্ছিল। আলোতে ভূমিকম্পের বেগটাও দেখা গেল। ঘরেব আসবাবপত্র ভয়ানক ভাবে দুলছে, কয়েকটা ছবি আশ্রয়চ্যুত হয়ে ঝুলছে, ঘড়ির কাঁটা গেছে থেমে।

মালতীর এখনও ঘুমের ঘোর ভাল করে যায়নি। শশাঙ্ককে

অসহায় ভাবে জড়িয়ে ধরে থেকে সে কাঁপছিল। এই নিদারুণ বিপদেব মুহূর্ত্তেও মালতীর সে আলিঙ্গনের স্বাদ শশাঙ্ক সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করে যেন নিশ্চল হযে উঠল। এমন কবে এত কাছে মালতী কোন দিন আসেনি। ভূমিকম্পে বুঝি মালতীর চারিধাবের প্রাচীর এতদিনে গেছে ভেঙে। মালতীকে এক হাতে জড়িয়ে রেখে আর এক হাতে দরজার খিলটা খুলতে খুলতে শশাঙ্ক বল্লে, শীগগীর নীচে চল মালতী, পুরাণো বাড়ীর দোতালা একে বিশ্বাস নেই।

মালতী প্রায় অস্ফুট স্বরে বল্লে—আমরা ত এক সঙ্গে আছি। আমরা ত' এক সঙ্গে আছি। শশাঙ্কের সমস্ত মন গুঞ্জন কবে উঠল আনন্দে। হোক ভূমিকম্প, হোক প্রলয, সে বুঝি আর কেয়ার করে না। মালতী ধরা দিয়েছে।

তারা ঘর থেকে বেরুবার আগেই সশব্দে একটা ছবি নীচে পড়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে দুজনে একবার সে দিকে চাইলে। মালতী নিজের অজ্ঞাতসারে সে দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। শশাঙ্ক তাকে বাধা দিয়ে বল্লে—থাক—নীচে চল আগে।

দুজনের একবার দৃষ্টি বিনিময হল। সে দৃষ্টির ভাষা জটিল, গভীর, শব্দের অতীত।

দুজনে এবার দ্রুতবেগে বেড়িযে পড়ল ঘর থেকে পরস্পরকে জড়িয়ে।

কিন্তু হায বেশী দূর তাদের যেতে হল না। ভূগর্ভের অগ্নিস্রোতের আলোড়ন মানুষের হৃদয়ের আলোড়নের তোয়াক্কা রাখে না। একটী জীবন নাট্যের পরিবর্ত্তন অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই মাঝখানে ভূমিকম্প

গেল থেমে। দরজা জানালা আর নড়ছে না। পৃথিবী শান্ত হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মালতী ধীরে ধীরে শশাঙ্কের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিলে নিজেকে। এতক্ষণ যেন সে অভিভূত হয়েছিল। আচ্ছন্নভাব এইবার তার কেটে গেল। সে আবার সেই আত্মস্থ অবিচলিত মালতী।

মালতী ধীরে ধীরে আবার ওপরে উঠে এল শোবার ঘরে। তার পেছনে এল ক্লান্তভাবে শশাঙ্ক। ভূমিকম্প যেন শুধু তাকেই বিধ্বস্ত করে গেছে।

মালতী ঘরে এসে ছবিটাকে তুলে ধরলে। কাঁচটা শুধু ভেঙ্গে গেছে আর কিছু ক্ষতি হয় নি।

মালতী শান্ত স্বরে বলে—সকালে কাঁচ বাঁধিয়ে নিয়ে এস।

শশাঙ্ক বিমূঢ়ভাবে রইল সামনে তাকিয়ে।

জনৈক কাপুরুষের কাহিনী

সকাল বেলা করুণা নিজে হাতেই চা নিয়ে এল।

চায়ের আনুষঙ্গিকের বহর দেখে না হেসে পারলাম না। বল্লাম,—তোমাদের এদেশী জলহাওয়া ভাল হতে পারে, কিন্তু আমার জীর্ণ করবার ক্ষমতাটা এখনো খাঁটি স্বদেশী আছে,—এই দুদিনে তার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি।

উত্তরে শুধু একটু হেসে প্লেটগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে করুণা চলে যাবার উপক্রম করতে আবার ডেকে বল্লাম,—তুমি কি আমার সঙ্গে লৌকিকতা স্থরু করে দিলে না কি? বিমলবাবু লৌকিকতা করলে না হয় বুঝতাম, কিন্তু—

কথার মাঝখানেই করুণা বল্লে,—বিমলবাবুর হয়েই যদি করি,—দোষ আছে কি?—তার পর হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালা সামনে ঠাণ্ডা হতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

না, করুণার ব্যবহারটা মোটেই ভাল লাগছে না,.একথা নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে আর বাধা নেই।

করুণা নাটকীয় একটা কিছু করে বসবে তা অবশ্য আশা করিনি। আশা কেন সেটা রীতিমত আশঙ্কার বিষয়ই ছিল। গোড়ায় তার সহজ স্বাভাবিকতায় তাই বুঝি আশ্বস্তই বোধ করেছি। কিন্তু মনের কোন গোপন কোণে আহত অহঙ্কার তারপর ধীরে ধীরে সাড়া দিতে সুরু করেছে। মনে হয়েছে এতটা হবার বুঝি দরকার ছিলনা। সূর্য্য

অস্ত গেছে যাক, কিন্তু তার বিলম্বিত রঙ পশ্চিমের মেঘে একটু লেগে থাকলে ক্ষতি কি ছিল।

নাটকীয় না হয়ে করুণা অতি মাত্রায় কঠিন ও সংযত হয়ে উঠলে বুঝি সব চেয়ে খুশি হতাম। ধরা দেবার ভয়ে তার সেই সযত্ন সাবধানতায় আমার আত্মাভিমান সবচেয়ে বোধ হয় তৃপ্ত হ'ত।

কিন্তু করুণা নাটকীয় উচ্ছ্বাস বা কঠিন ঔদাসীন্য দুইএর কোন দিক দিয়েই গেলনা।

তাতে আমার কিছু আসে যায় না, অনায়াসে এই কথাই ভাবতে পারতাম। এবং তাই ভাবাই ছিল উচিত। সত্যিই করুণার সঙ্গে দেখা হবার কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা আমার ত ছিল না। তার সঙ্গে দেখা হবার কথাও নয়। বিশাল পৃথিবীর জনতায় এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে আমরা হারিয়ে গেছলাম যে কোন দিন আবার পরস্পরকে খুঁজে পাওয়াই ছিল অভাবিত।

কিন্তু সেই অভাবিত ব্যাপার যখন ঘটল তখন দেখলাম করুণাকে অনায়াসে ভুলে গেছি যখন মনে করেছি তখনও সে আমায় ভুলতে পারে না—মনের এ গোপন গর্ব্বটুকু ত্যাগ করতে পারিনি।

এ রকম একটা গর্ব্ব থাকা খুব অস্বাভাবিক বোধ হয় না।

সে সব দিনের কথা একেবারে ভোলবার ত নয়। বিশেষ করে সেই একটি বিকেল। সারাদিন বাইরে অবিশ্রান্ত ভাবেই বৃষ্টি পড়েছে, ইচ্ছে থাকলেও কোথাও আর বার হওয়া হয়নি। বিকেলে চাকর এসে খবর দিলে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে।

এই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে একটি মেয়ে। প্রথমটা

সত্যিই একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলাম। চাকরের সঙ্গে করুণা যখন ঘরে এসে ঢুকল তখনও আমার মুখের বিস্ময় নিশ্চয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

চাকর চলে যাবার পর করুণা কাছে এগিয়ে এসে বল্লে,—খুব আশ্চর্য্য হয়েছ, না?

তা একটু হয়েছি, কিন্তু তুমি যে একেবারে ভিজে গেছ।—আমি সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

করুণা কাছের একটা চেয়ারে বসে বল্লে,—বৃষ্টিতে বেরুলে ভিজতেই হয়, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না।

তারপর হেসে উঠে বল্লে,—ব্যস্ত হয়ে করবেই বা কি। তোমাদের এ নারী-বিবর্জ্জিত রাজ্যে মেয়েদের পোষাক পাবে কোথায়? সখের থিয়েটার-পার্টিও নিশ্চয়ই তোমাদের নেই।

একটু ভেবে বল্লাম,—ওপরে দশ নম্বরে একজনেরা আছেন—স্বামী স্ত্রী।

করুণা আবার হাস্‌ল,—তাঁদের কাছে শাড়ী ব্লাউজ চাইতে যাবে? কি বলে চাইবে?

হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্লে,—তার চেয়ে ভিজে কাপড়েই আমি বেশ আছি। আমার অসুখ করবে না, ভয় নেই।

অগত্যা তার পাশে গিয়ে বসলাম। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই সে আবার বল্লে,—ভাবছ, এমন ভাবে এখানে আসার মানে কি? কেমন?

এবারও কোন উত্তর দিলাম না। করুণা খানিকক্ষণের জন্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মনে হ'ল। তারপর সম্পূর্ণ

রূপান্তর। এই দুর্ব্বার আবেগ সে এতক্ষণ জোর করে ধরে রেখেছিল বুঝলাম।

একেবারে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ব্যাকুল স্বরে বল্লে,—আমায় পাটনায় নিয়ে যাচ্ছে। মামা কাল চিঠি দিয়েছেন।

বুঝতে কিছু পারলাম না এমন নয়। তবু বেদনাময় সত্যটা যতক্ষণ সম্ভব অস্বীকার করে বল্লাম,—তোমাদের কলেজের ত ছুটি হচ্ছে?

করুণা আরো ব্যাকুল স্বরে বল্লে—না না তা নয়। তুমি বুঝতে পারছ না। এখানে আমায় আর রাখবে না, এই যাওয়া আমার শেষ।

তার ঠাণ্ডা একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। হ্যাঁ, বেদনা সেদিন আমার হৃদয়েও ছিল, কিন্তু করুণার উদ্বেল আবেগের তুলনায় সে বুঝি কিছু নয়। আমার ভালবাসার মধ্যে সে উদ্দামতা ছিল না যা ভাগ্যের বাধার বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহ করতে পারে।

কিন্তু করুণা খানিক বাদে অশ্রুসজল মুখ তুলে দৃঢ় স্বরে বল্লে,—আমি যাব না, কিছুতেই যাব না। কেন যাব?

কি উত্তর এ কথার দেবো ভেবে পেলাম না। মনের গভীরতায় হয়ত সেদিনই তার এ বিদ্রোহে আমার সায় ছিল না। তখনই আমি জানতাম যে এ বিদ্রোহ নিস্ফল।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় বল্লাম—তুমি যা মনে করছ তা ত নাও হতে পারে করুণা, তুমি হয়ত মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।

করুণা আবার অস্থির হয়ে উঠল,—না, না, আমি জানি, জোর

করে তাঁরা আমায় সেখানে বন্দী করে রাখতে চান। তাদের ধারণা এ সব ছেলেমানুষী সারাবার তাই অব্যর্থ ওষুধ।

করুণা একটু তিক্ত হাসি হাসল।

তারপর আবার বল্লে,—আমি কলেজ যাবার নাম করে বেরিয়ে এসেছি। এখানে এসে তোমায় অসুবিধায় ফেলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু না এসে যে উপায় নেই, পিসিমার বাড়ীতে তোমার যাওয়া ত প্রায় বন্ধ হয়েছে। সেখানে এসব কথা তোমায় জানাতেও পারতাম না।

একটু থেমে করুণা আবার অস্থির হযে উঠল আবেগে,—সত্যি কি আমায় নিয়ে যাবে জোর করে। কিছুই আমরা করতে পারব না?

সেদিন কি আশ্বাস, কি সান্ত্বনা দিয়ে করুণাকে তার পিসিমার বাড়ি রেখে এসেছিলাম, তার বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই, কিন্তু মনে যত বড়ই ব্যথা পেয়ে থাকিনা, কিছুই তারপর করতে পারিনি এটা ঠিক।

করুণাকে তার মামারা জোর করে কিনা জানিনা তারপর পাটনায় নিয়ে গেছে, যাবার আগে দেখা করবার সুযোগও মেলেনি আমাদের।

নিমন্ত্রিত অবশ্য হইনি, কিন্তু একদিন কোথা থেকে করুণার বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদও কাণে এসেছে। নির্লিপ্ত নির্বিকার মনে সে সংবাদ শুনেছি এমন কথা বলতে পারব না, কিন্তু আজ বিশ্লেষণ করে

দেখে বুঝতে পারবি এ সংবাদ পাবার পর কয়েকটি দিন ও রাত যে আমার কাছে হতাশায় ধূসর হয়ে গেছে, তা প্রধাণত করুণার দুঃখের কথা ভেবে। ভালবেসে না পাওয়ার ব্যর্থতা সেদিন নিজের দিক দিয়ে নয়, করুণার দিক দিয়েই উপলব্ধি করেছি, এবং সেই উপলব্ধির বেদনায় নিজের আত্মপ্রসাদ কিছু কম ছিল কিনা তা বোঝবার শক্তি তখন ছিল না।

করুণার স্মৃতি যখন ম্লান হয়ে এসেছে তখনও মনের কোন্ গোপন কোণে এ বিশ্বাস বুঝি ছিল, যে আমি ভুললেও সে কোন দিন ভুলতে পারে না।

সে বিশ্বাসে রূঢ় আঘাত পাওয়ার পরই মনের যে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া সুরু হল তাতে নিজের কাছেই নিজে কেমন একটু লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু তবু আত্মসংযম করতে পারলাম না।

করুণা খানিক বাদে যখন আমার ঘরে এল তখন আমার আচরণে ও কথায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন চেষ্টা করলে হয়ত সেও লক্ষ্য করতে পারত।

করুণা খাবার প্লেটটার দিকে চেয়ে বল্লে,—এ কি। কিছুই যে খাওনি।

পাঞ্জাবির বোতাম আঁটতে আঁটতে তার দিকে ফিরে চাইলাম, একটু হেসে বল্লাম,—লৌকিকতার বদলে লৌকিকতাই করতে হয় যে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত প্লেট সাফ্ করে ফেল্লে তুমি ভাবতে কি ?

—তুমি এখনো সেই এক কথা ধরে বসে আছ।—করুণার স্বর একটু যেন ক্ষুণ্ণ।

—এক কথা ধরে বসে থাকা আমার একটা দুর্ব্বলতা করুণা, এখনও এটা শোধ্‌রাল না।—আমার স্বর বেশ গাঢ।

করুণা অন্য দিকে ফিরে খাবার প্লেটটা সরিয়ে রাখছিল, তার মুখ দেখতে পেলাম না। কিন্তু যে উত্তর সে দিলে তাতে সহজ কৌতুক ছাড়া আর কিছুরই আভাষ নেই।

আর সব দুর্ব্বলতা তাহলে শুধরে ফেলেছ '—আমার দিকে ফিরে করুণা আবার বল্লে,—একি এরই মধ্যে বেরুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, গাড়িটার কতদূর কি হ'ল একবার দেখতে ত হয়।

তুমি দেখলেই ত সেটা তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে যাবে না। উনি-ত খোঁজ নিয়ে আসবেন বলেছেন। ওঁর ফিরতে আর দেরী নেই। তোমায় থাকতেই বলে গেছেন।

সুতরাং ততক্ষণ তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতে বলছ ?—হেসে বলবার চেষ্টা করলাম।

সকৌতুক মুখভঙ্গি করে করুণা বল্লে,—তা করতে পার।

আমার স্বর আপনা থেকে তখন বুঝি গাঢ় হয়ে এসেছে,—অনায়াসে বলে ফেল্লে যে করুণা।

এমন কি একটা কঠিন কথা যে অনায়াসে বলা যায়না ?—করুণার মুখে একাধারে হাসি ও বিস্ময়।

এমন কিছু কঠিন নয় করুণা ? সত্যি বলছ ? আমার সঙ্গে একা বসে গল্প করতে তোমার ভয় করেনা ? আমার যে নিজেকে এখনো ভয় করে।

তোমার মাথাটি বেশ খারাপ হয়েছে দেখছি।—বলে হেসে আমায়

বেশ একটু অপ্রস্তুত করে করুণা এবার বেরিয়ে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে আবার বল্লে,—তুমি কিন্তু যেওনা, আমি এখুনি আসছি।

কিন্তু অনেকক্ষণ করুণা তারপর আর আসে না। ঘরের ভেতর পাযচারি কবে বেডাতে বেডাতে মনের মধ্যে কি যেন একটা জ্বালা অনুভব করি। সেটা আমার নিজের না করুণার বিরুদ্ধে বোঝা শক্ত। হযত সেটা নিয়তির বিরুদ্ধে।

কি দবকাব ছিল এমন করে আবার তার সঙ্গে দেখা হবার। দেখা হওযাটা দৈবের আযোজিত পরিহাস ছাড়া আর কি?

কদিন ছুটি পেয়ে মোটরে একটু ঘুরতে বেরিযেছিলাম। কাল রাত্রে এই শহরের মাঝখানে এসে যখন তার কল হঠাৎ বিগডে গেছল তখন জঙ্গলের পথে না হয়ে একটা ভদ্রগোছের শহরের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদই দিয়েছিলাম। ভবিষ্যৎটা তখন জানতে পারলে বোধ হয় জঙ্গলের পথটাই শ্রেয মনে করতাম।

একে রাত্রিকাল তায় অচেনা শহর। ডাকবাংলো ও ষ্টেশনের ওযেটিংরুম থেকে দরিদ্রতম হোটেল পর্য্যন্ত টাঙ্গা করে ঘুরে আশ্রয় না পেযে শেষে যে কারখানাতে মোটর মেরামত করতে দিযেছিলাম সেখানেই ফিরে গেছলাম হতাশ হয়ে। সেখানেই বিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। কাছাকাছি একটা কয়লার খনিতে তিনি কাজ করেন। সেখানকাব কি প্রযোজনে এ কারখানায এসেছিলেন। প্রবাসে বিপন্ন

বাঙালীর সাহায্যে তিনি নিজে থেকেই অগ্রসর হয়ে তাঁর বাড়িতে রাত্রি কাটাবার প্রস্তাব করেছিলেন। সামান্য একটু আপত্তি হয়ত করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা শোনেন নি।

শহরের নির্জ্জন এক প্রান্তে বিমলবাবুর বাড়ি। সেখানে পৌছে দেখা গেছল সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে বিমলবাবু বলেছিলেন,—আজ আমার আসবার কথা ছিল না কি না। চাকর ব্যাটারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে একটি মহিলাই লণ্ঠন হাতে এসে বাইরের দরজা খুলে নিদ্রাজড়িত স্বরে বলেছিলেন,—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি যে বলে গেছলে আজ আসবে না '

বিমলবাবু হেসে বলেছিলেন,—বরাতে একটা পরোপকারের পুণ্য ছিল, তাই বোধ হয় আসার সুবিধে হয়ে গেল। আমি না এলে এই ভদ্রলোক একটু বিপদেই পড়তেন বোধ হয় অজানা শহরে।

করুণা এইবার আমায় দেখতে পেয়েছিল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে সরে যেতে গিয়ে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বিমলবাবু তখনও বলে চলেছেন,—তুমি চাকরগুলোকে ডেকে দাও, বাইরের ঘরটা খুলে একটা বিছানা ঠিক করে দিক। ভদ্রলোকের একটু কষ্ট হবে

হঠাৎ তাঁকে করুণার কথায় সবিস্ময়ে থেমে যেতে হয়েছে।

করুণা হেসে বলেছে,—বিদেশ বিভুঁয়ে একটু কষ্ট হলই বা ভদ্রলোকের '

বিমলবাবু অবাক হয়ে আমাদের দুজনের মুখের দিকে চেয়েছেন, —তার মানে! এঁকে তুমি চেন নাকি!

তা একটু চিনি বই কি!—করুণা হেসে উঠেছে।

কি আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্যটা কিসের! তোমার অচেনা বলে আর আমার চেনা হতে নেই! তোমার সঙ্গে ত মাত্র তিন বছর বিয়ে হয়েছে, তার আগে কুড়ি বছর আমি সলিটারি সেলে ছিলাম মনে কর!

বিমলবাবু হেসে ফেলে বলেছেন,—কিন্তু ভদ্রলোককে বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের দাম্পত্য-জীবনের নমুনাটা নাই দেখালে।

করুণা গম্ভীর হবার ভাণ করে বলেছে,—ও, আমি শুধু ঝগড়া করি এই তুমি বোঝাতে চাও!

এবার একটা কিছু বলা উচিত বলেই হাসবার চেষ্টা করে কথা বলেছি,—ব্যবসাই পেশা বিমলবাবু, নমুনা দেখে আমি ভুলি না।

এতদিন বাদে করুণার প্রথম আলাপের ধরণে তখনই মনে কোথায় আমার একটা খট্‌কা লেগেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন নিজেই বেরিয়ে পড়ব কি না ভাবছি তখন করুণা এল। সাজ-পোষাকের পরিবর্ত্তন দেখে যা বলতে যাচ্ছিলাম নিজে থেকেই তার উত্তর দিয়ে সে বল্লে,—একটু বাইরে যেতে হবে। আসবে আমার সঙ্গে?

চাদরটা আলনা থেকে তুলে নিয়ে বল্লাম,—শুধু আদেশের অপেক্ষা। কিন্তু কোথায় যাচ্ছ ?

বাজার করতে,—বলে করুণা হাসলে।

বাজার করতে '—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি ত প্রায় যাই।—সে হেসে বল্লে '—এখানে 'চেঞ্জার' ছাড়া বাসিন্দাদের মেয়েরা বড একটা নিজেরা বাজারে যান না বটে, কিন্তু আমি ও সব মানিনা। উনি না থাকলে আমি নিজেই চাকর নিয়ে বেরিয়ে পাড।

কিন্তু বিমলবাবু ত আজ আছেন।

ও, তোমায় বুঝি বলা হয়নি। উনি খবর পাঠিয়েছেন আজ আর আসতে পারবেন না, হঠাৎ বিশেষ জরুরি কাজে আটকে পড়েছেন।

করুণা বেশ সহজ ভাবেই কথাটা বলে গেল। কিন্তু আমি রাস্তার মাঝেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লাম,—তাহলে !

তাহলে আর ভাবনা কিসের ! উনি না থাকলে কি তোমার যত্ন হবে না।—করুণার চোখে-মুখে কৌতুকের দুষ্টু হাসি।

গম্ভীর হয়ে বল্লাম,—তা নয় করুণা, আমি ভাবছি ·

তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে সুরু করলে, আমায় একাই এগিয়ে যেতে হবে।

অগত্যা নীরবে তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হ'ল। এ দিকের পথটা বেশ নির্জ্জন। দূরে দূরে দু'একটা বাড়ি। তারও অনেকগুলি খালি পড়ে আছে। রাস্তায় লোক নেই বল্লেই হয়।

খানিকদূর নীরবে চলার পর প্রশ্ন না করে পারলাম না,—বিমলবাবু আজ রাত্রে ফিরবেন ত ?

বোধ হয় না। এখন দু'চারদিন হয়ত সেখানে থাকতে হবে।

আবার নীরবে অনেকটা পথ পার হয়ে গেলাম। করুণা কয়েকবার আমার দিকে ফিরে তাকাবার পর হেসে বল্লে,—কি ভাবছ অত গম্ভীর ভাবে ?

ভাবছি আজই আমায় চলে যেতে হবে।

তোমার গাড়ি ত আজকের মধ্যে মেরামত হয়ে উঠবে না।

গাড়ি এরা পরে পাঠিয়ে দেবে'খন। আমি ট্রেণেই যাব।

এত ব্যস্ত কেন ? তোমার এখানে ভয় কিসের ?

রাস্তার মাঝে আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম,—বলেছি তো ভয় আমার নিজেকে,—নিজেকে আমি বিশ্বাস করি না।

করুণা এবার বেশ জোরেই হেসে উঠল।—নাই বা করলে, তাতে কারুর ত কোন ক্ষতি নেই।

না, এ বুঝি আর সওয়া যায় না। হঠাৎ সমস্ত সংযম হারিয়ে তার হাতটা ধরে ফেল্লাম,—ক্ষতি যদি তোমারই হয়· ·

করুণা হাত ছাড়িয়ে নিল না। কিন্তু পরিহাসের হাসিতে আমার সমস্ত আবেগকে নিষ্ঠুর ভাবে হাল্কা করে দিয়ে বল্লে—কেমন করে হবে ? আমি ত নিজেকে বিশ্বাস করি।

করুণার হাত ছেড়ে দিয়ে বল্লাম,—সে বিশ্বাস এখনো কি ভেঙে চুর হয়ে যেতে পারে না করুণা ? সমস্ত নোঙর ছিঁড়ে তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ঢেউ কি আসতে পারে না ?

করুণার চোখে সেই দুর্ব্বোধ সকৌতুক হাসি,—কি জানি, পরীক্ষা অবশ্য হয় নি।

কি তারপব বলতাম ঠিক জানি না, কিন্তু রাস্তা এবাব জনবহুল হযে এসেছে। বাধ্য হয়েই চুপ করে গেলাম।

সকালবেলা বাইরে বার হবার পোষাকে করুণার এক রূপ দেখেছিলাম। দুপুরবেলা ষোডশোপচার আহারের আযোজনের সামনে বসে তার আর এক রূপ দেখলাম। একটি শাদা সেমিজের উপর লাল চওডা কস্তাপাড শাডি পরে আধ-ঘোমটার পাশ দিয়ে ভিজে এলোচুল পিঠে এলিযে সে কাছে এসে বসল। এমন আশ্চর্য্য তাকে কোন দিন লাগে নি।

পাখাটা নাডতে নাডতে হেসে সে বল্লে,—কি দেখছ? কখন দেখ নি নাকি!

মনে হচ্ছে সত্যি কখন দেখিনি!

তা হতে পারে!—বলে সে অদ্ভুত ভাবে হাসল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা, আমার বাজার করা দেখে কি ভাবছিলে বলত?

এই কথাই ভাবছিলাম যে তুমি আমার কাছে একটা নতুন আবিষ্কার!

তাই নাকি, কিন্তু দোহাই বেচারা কলম্বাসের দাবিটুকু উডিযে দিও না।

কলম্বাসের আগেকার দাবি যদি থাকে।

দাবি থাকলেও দলিল নেই ত'—নিজের রসিকতায় করুণা নিজেই হেসে মাৎ করে দিলে।

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ খেয়ে যাবার পর বল্লাম,—দলিলের দাম সকলের কাছে নেই! ও তুচ্ছ জিনিষ অনায়াসে পুড়িয়ে ফেলা যায়।

এবার করুণা হাসল না। আমার মুখের দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে,—তোমায় মিষ্টি দেওয়া হয় নি, বলে হঠাৎ উঠে গেল।

তারপর মিষ্টি করুণা নিয়ে এল না, নিয়ে এল ঠাকুর।

কিন্তু খানিক বাদে ঘরে সে নিজেই পান নিয়ে এল, এবং হঠাৎ বলে বসল,—তুমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই তাহলে যাচ্ছ?

সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। আমারই মনের ভুল, না তার মুখে একটা অস্ফুট অস্থিরতার ছায়া?

বল্লাম—বেশ, তাই যাব।

বেশ, তাই যাব, 'মানে। আমি যেন তোমায় জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছি! আমি ত তোমায় থাকতেই বলছি, তুমি নিজেই ত যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলে তখন!

—গলার ঝাঁঝটা এবার লুকোবার নয়।

হেসে বল্লাম,—আমি কি তোমায় দোষ দিচ্ছি? আমার সত্যিই না গেলে নয়!

একটু যেন লজ্জিত হয়ে করুণা হাসবার চেষ্টা করে বল্লে,—তা জানি, এমন জায়গায় তোমার মন টেঁকে? কিন্তু শোন, সন্ধ্যায় ঐ

একটি ছাড়া আর গাড়ি নেই তা জান ত? ঠিক সাড়ে ছটায়, মনে থাকে যেন।

গাড়ির সময় আমার মনে রাখবার প্রয়োজন ছিল না। বিকেল না হতেই জিনিষপত্র বাঁধিয়ে, আমায় মোটরের কারখানায় খবর দিতে পাঠিয়ে, ষ্টেশনে যাবার গাড়ি ডাকিয়ে করুণা নিজেই সব বন্দোবস্ত করে ফেল্লে, এবং ষ্টেশনে যাবার পনেরো মিনিটের পথ যেতে পাছে কোন গোলমাল হয় বলে এক ঘণ্টা আগে আমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল।

এতক্ষণ আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু বলবার অবসর তার মেলে নি।

বাড়ি থেকে টাঙ্গায় ওঠবার সময় সে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে,—তুমি আমায় কি ভাবছ কে জানে! যেন তোমায় বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি মনে হচ্ছে, না?

সেইটুকু ভেবেই যা কিছু সান্ত্বনা!

করুণা হেসে উঠল—সান্ত্বনাটা এত সস্তা হলে আর সত্যিকার কিছু মেলে!

টাঙ্গাওয়ালার গাড়ি চালানোর শব্দে তার হাসির রেশ মিলিয়ে গেল।

এ গল্পের শেষ ঐখানেই হলে ভাল হ'ত, কিন্তু তা হল কই!

ষ্টেশনে যখন পৌছালাম তখনও ট্রেনের অনেক দেরি।

ওয়েটিংরুমে জিনিষপত্র রেখে এদিক ওদিক অকারণে ঘুরে বেড়িয়েও সময় কাটাতে না পেরে তখন বইএর ষ্টলে এসে দাঁড়িয়ে কি কেনা যায় ভাবছি। হঠাৎ পাশে চোখ পড়ায় চমকে উঠলাম।

এ কি! করুণা, তুমি এখানে?

ম্লান একটু হেসে বল্লে,—এই এলাম!

ষ্টেশনের শেডের আবছা আলোর দরুণ, না সত্যিই, করুণাকে দুর্ব্বল দেখাচ্ছে।

ষ্টল থেকে একটু সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না করুণা, হঠাৎ ষ্টেশনে আসার মানে?

করুণা আবার হাসল, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্লে,—দলিল পুড়িয়ে দিয়ে এলাম।

খানিকক্ষণ সত্যিই কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। তারপরে ব্যাকুলভাবে বল্লাম,—কি বলছ করুণা!

খুব অসম্ভব কি কিছু বলছি? সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত ঢেউ কি আসে না কখনো? করুণার স্বর ক্রমশঃ যেন গাঢ় হয়ে উঠল।

আমার বুকের একেবারে কাছে এগিয়ে এসে চোখের দিকে চোখ তুলে সে বল্লে,—তুমি আমায় নিয়ে যেতে পার না? যাবে না নিয়ে, বল?

অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লাম,—আমি ·তোমায় নিয়ে

কোথায় যাবে ভাবছ? যেখানে খুসি!

কোন কথা এবার আর মুখ দিয়ে বেরুল না। মনের ভেতর শুধু একটা অস্থির আলোড়ন অনুভব করছি।

তোমার অনেক অসুবিধা, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে জানি, কিন্তু আমিও ত তারই জন্যে প্রস্তুত হয়ে সমস্ত লজ্জা কলঙ্ক নিন্দা মাথায় নিয়ে এসেছি!

করুণা কাতর ভাবে মুখের দিকে চেয়ে আছে। কি বলব! কি এখন বলতে পারি! তাকে আঘাত না দিয়ে সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা কি আছে! নির্ব্বোধের মত আমিই তার রুদ্ধ বন্যার বাঁধ খুলে দিয়েছি, এখন তাকে কেমন করে ফিরিয়ে দেব?

কিন্তু সব কথা তুমি বোধ হয় ভাল করে ভেবে দেখ নি করুণা। যে ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়ত আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে সুরু করব।

করুণা তখনও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে —অত্যন্ত ধীরে ধীরে তার সমস্ত মুখ যেন বিদ্রূপের হাসিতে ভরে উঠল।

তোমার মূল্যবান উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।—আর একটু হলেই নোঙর উপড়ে গেছল আর কি!—করুণা এবার সশব্দেই হেসে উঠল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। সমস্তই কি তবে আমাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে অভিনয়!

করুণা সহজ ভাবে বল্লে,—যাও তোমার ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়েছে। আমার ট্রেনেরও বোধ হয় দেরি নেই।

তোমার ট্রেন।

পিসিমারা কলকাতা থেকে আসছেন। তাঁরা বাড়ি চেনেন না। উনিও নেই, তাই নিজেই এলাম নিযে যেতে। শুনে খুব হতাশ হলে বুঝি?

কোন কথা আর না বলে ওধারের প্লাটফর্মে যাবার জন্যে ওভার-ব্রীজের দিকে অগ্রসর হলাম। করুণাকে শেষ যখন দেখতে পেলাম তখন ষ্টলের বইগুলোব দিকে সে ঝুঁকে পড়েছে।

সত্যিই পিসিমাদেব নিযে যাবার জন্যে সে কি ষ্টেশনে এসেছিল?

জীবনে কোনদিন সে কথা জানা যাবে না।

নতুন বাসা

শীর্ণ কঙ্কালসার বেড়ালছানাটা পাশের নর্দ্দামা থেকে সারা গায়ে কাদা মেখে কোন মতে রাস্তার ধারে উঠে এসে কাতরভাবে ডাকছে। গলা তার অবশ্য এখন অত্যন্ত ক্ষীণ—একেবারে থেমে যাবার আর দেরী নেই।

অমল নোংরা সরকারী কলতলার পাশ দিয়ে সরু গলিটায় ঢোকবার আগে এক মুহূর্ত্তের জন্যে বুঝি একটু থমকে দাঁড়ায়। গত দুই রাত বেড়াল ছানাটা বড় জ্বালিয়েছে—কোথা থেকে কে ছানাটাকে এই নর্দ্দামায় ফেলে দিয়ে গেছল কে জানে—সারা দিন রাত তার কাতর একঘেয়ে ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

কিন্তু অমলের অস্বস্তিটা শুধু বিরক্তির দরুণ নয়, মনের কোথায় একটা অক্ষমতার গ্লানিও যেন তাকে বিঁধেছে। সেটা আমল দেবার জিনিষ নয় অমল বুঝেছে—একটা আধমরা নোংরা বেড়াল ছানা, অমল তার কি করতে পারে। কিছু করতেই বা তাকে হবে কেন? যতই কাতর ভাবে সেটা চেঁচাক, তাকে বাঁচান ত আর অমলের দায় নয়।

নর্দ্দামার ধারের জানলাটা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে অমল কালরাত্রে শুয়ে পড়েছিল। তাকে ঘুমোতে হবেই। সকাল থেকে তার অনেক কাজ। কিন্তু তবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম কিছুতেই আসেনি।

বেড়াল ছানাটার দিকে একবার তাকিয়েই অমল আবার হনহন

ক'রে এগিয়ে যায়। একটা আধমরা বেড়াল ছানার কথা ভাবলে তার চলবে না।

বাইরের দরজাটা ঠেলে উঠোনে পা দিতেই পিসিমা চেঁচিয়ে ওঠেন—হ্যাঁরে, ক'টা মুটে আর একটা গরুর গাড়ী ডাকতে এই এত দেরী! কখন জিনিষপত্র তোলা হবে, আর কখনই-বা সেখানে গিয়ে ঘর-দোর গুছোব!

গরুর গাড়ী পাইনি, একটা লরী ঠিক করে এসেছি—ব'লে অমল উঠোন পার হয়ে তাদের দিকের রকে গিয়ে ওঠে।

লরী!—পিসিমা প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান, লরী—সে যে অনেক ভাড়া!

অনেক ভাড়া নয়! তোমার এই রাজ্যের মাল ত আর একটা গরুর গাড়ীতে হ'ত না—লরীতে এক খেপেই হয়ে যাবে, তাড়াতাড়িও হবে!—ছুটো টাকা বেশী তাতে লাগলই বা।

অন্যদিন হ'লে পিসিমা বোধ হয় এত সহজে প্রবোধ মানতেন না। ছুটো টাকা যে কতখানি, কতদিক সামলে কি পরিশ্রমে, কি ভাবে ছুটো টাকা যে তাঁকে সংসারে সঞ্চয় করতে হয়, কি সামান্য আয় থেকে কি ভাবে তিনটি অনাথ ভাইপোকে তিনি মানুষ ক'রে তুলেছেন, সমস্ত সুদীর্ঘ ইতিহাসই হয়ত অমলকে শুনতে হ'ত। কিন্তু আজ তাঁর মেজাজটা অত্যন্ত প্রসন্ন, তিনি একটু উদারভাবেই বলেন,—তা বেশ করেছিস, তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঠা যাবে ত'।

পাশের ঘরের ভাড়াটেদের বৌ মানদা কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে, এঁটো বাসন-কোষন হাতে নিয়ে কলতলায় যেতে একটু কৌতূহলভরে

থেমে দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ ক'রে পিসিমা বলেন—গরুর গাড়ীর যা ঢিমে চাল—সেই এবেলা আর ওবেলা, তাতে কি আর আজকের মধ্যে ঘর-দোর গুছোন হ'ত। যেমন তেমন দুটো খুপরি ত নয়, যে এখানকার মত জিনিষ-পত্র ঠাসাঠাসি ক'রে রাখলেই হবে—পাকা ঘর, অঢেল জায়গা, ভালো ক'রে একটু গুছিয়ে না বসলে পাড়াপড়শী বলবে কি।

নতুন ভাড়া করা বাসার গুণ বর্ণনা একবার সুরু হলে আর শেষ হবে না জেনে মানদা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। এ কয়দিন পিসিমার কাছে নতুন বাসার বর্ণনা সবিস্তারে শুনতে এ বাড়ীর কোন ভাড়াটের বাকী নেই। সে যে এমন টিনে ছাওয়া কাঁচা গাঁথুনীর পাঁচ ভাড়াটে একত্র করা বাড়ী নয়, দস্তুরমত ভালো রাস্তায় ভদ্র পাড়ায় একখানা আলাদা পাকা বাড়ী,—তার আশে পাশে এমন নোংরা নর্দামা যে নেই—যত রাজ্যের উড়ে খোট্টা ছোটলোকের সঙ্গে সেখানে যে কলতলায় জল নিতে যেতে হয় না, ইত্যাদি সকল সংবাদই তারা পেয়েছে।

পিসিমার কাছে বাড়ী বদল একটা বাহাদুরীর ব্যাপার—প্রতিবেশীদের একটু ঈর্ষ্যা, একটু বিস্ময় জাগাতে পেরেই তিনি সুখী। কিন্তু অমলের কাছে সত্যিই এই বাড়ী বদল একটা মুক্তি—একটা পরিত্রাণ।

এই আবেষ্টনের মধ্যেই সে মানুষ হয়েছে সত্য, কিন্তু তবু এখানে সে হাঁপিয়ে ওঠে, এর চেয়ে বিস্তৃত মুক্ত জীবনের স্বাদ তার মনে আছে।

তাদের তিনটি অনাথ ভাইকেই পিসিমা কোন রকমে মানুষ করেছেন। তাই এরা সাবালক হ'তে না হ'তেই কাজে ঢুকেছে, তাদের রোজগারে ও পিসিমার হিসাবী পরিচালনাতেই এ সংসার দিন দিন উন্নতি করেছে। অমলকে তাই আর পড়াশুনা ছেড়ে অল্প বয়সে রোজগারের চেষ্টা করতে হয়নি, সে কলেজে পড়ে।

একটি ছোট খুপরীর মত ঘর তার জন্যে এ বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট। একটি প্রমাণ তক্তাপোষেই ঘরটি জুড়ে যায়, জামা কাপড়ের আলনাটা থেকে কাপড়-চোপড় তার বিছানার ওপরই ঝুলে থাকে। বই কাগজ রাখবার একটা চৌকি আছে এক পাশে। পড়াশুনা তাকে তক্তপোষের ওপরে করতে হয়।

ঘরে একটি মাত্র জানলা। পেছনের খোলা নর্দ্দমার দুর্গন্ধের দরুণ সেটা অধিকাংশ সময়েই বন্ধ রাখতে হয়। দুর্গন্ধ যখন না আসে তখনও নিস্তার নেই। পাশের বাড়ীর একটি কলহপ্রবণ দম্পতীর প্রতিদিনের ঝগড়া লেগেই আছে।

নতুন যে বাড়ীতে তারা উঠে যাচ্ছে, সেখানে একটি চমৎকার ঘর সে নিজের জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছে। দোতলার ওপর প্রকাণ্ড বড় বড় দু'টি জানলা সমেত ঘর। একদিকের জানলা দিয়ে আবার পাশের বাড়ীর সাজান একটি বাগান পেরিয়ে কাদের রাস্তাটুকু দেখা যায়।

সে ঘরটুকুই যেন এই দুঃসহ আবেষ্টন থেকে মুক্তির প্রতীক। অন্ততঃ সে ঘরে গভীর রাত্রে দেয়াল ভেদ ক'রে পাশের কুঠুরির অসহায় মেয়ের রুদ্ধ কান্না ত' শোনা যাবে না।

পাশের ঘরের এই চাপা কান্নায় কতদিন তার ঘুম ভেঙে গেছে গভীর রাত্রে। এ যেন কোন একজন বিশেষ মানুষের নয়, সমস্ত নোংরা দরিদ্র দুর্ব্বল বস্তিটারই রুদ্ধ আক্ষেপ।

কান্না যেদিন বাড়ে সেদিন এখানে অস্থিরভাবে তাকে পায়চারী ক'রে বেড়াতে হয় নিজের ঘরে। কি করতে পারে সে! কিছুই না। পৃথিবীতে এত অবিচার এত দুঃখ এত শোক—তার তা নিয়ে অস্থির হয়ে লাভ কি!

কার বেকার স্বামী দেনার দায়ে স্ত্রী-পুত্র ফেলে পলাতক হয়েছে, কোন্ হতভাগিনী সারাদিন মুখ বুঁজে পরের বাড়ী দাসীগিরি ক'রে কোনমতে ছেলে-মেয়ের মুখে অন্ন দেবার চেষ্টা করে, গভীর রাত্রে নির্জ্জনে নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারে না—তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কি দরকার।

মেয়েটিকে সে দিনের বেলায় ভালো ক'রেই দেখেছে। প্রতিবেশী হিসেবে ভাল ক'রেই তাকে জানে। অত্যন্ত ঝাঁজালো তার মুখ,—তার দিনের বেলার সে উগ্র চেহারা দেখে মনে হয় না গভীর রাত্রে তার কণ্ঠ থেকে অমন কাতর কান্না বা'র হতে পারে।

হয়ত নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে এই মুখোস তুলে ধ'রে মেয়েটি ভালোই করেছে। কিন্তু এই মুখোস দিয়েই সে পার হয়ে যাবে কি! এ বাড়ীর লোকেরা তার সম্বন্ধে বলাবলি করে—তার চাল-চলন নাকি ভালো নয়।

হবেও বা। কিন্তু কি দরকার তার এ সব দুর্ভাবনার। সে এই আবেষ্টন থেকে সরে যেতে চায়—যেখানে এসব ভাবনা তার দরকার হবে না—

—যেখানে প্রতিদিন বাড়ীর দরজা দিয়ে বা'র হ'তে রুগ্ন অবিনাশের সঙ্গে দেখা হবে না।

লাঠিটায় ভর ক'রে প্রতিদিন সকালে প্রৌঢ় অবিনাশ গলিটার মুখে পৈঠেটার ওপর গিয়ে বসে হাঁপায়। তার বেশী তার যাবার ক্ষমতা নেই।

কলেজে যাচ্ছ বুঝি অমল—ব'লে অবিনাশ কাশতে থাকে।

অমলের সত্যি এই রুগ্ন লোকটার পাশে দাঁড়াতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। কি রোগ তার কে জানে।

কিন্তু তবু তাকে দাঁড়াতে হয়।

অবিনাশ কাশি থামিয়ে বলে,—তোমার সেই ডাক্তারের কাছে আর ত নিয়ে গেলে না ভাই।

অমল একদিন তার দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে নিজে থেকেই এ প্রস্তাব করেছিল। তার পর আর সময় হয়নি।

অমল নিজের ত্রুটিটাকে চাপা দেবার জন্যেই বলে—আপনাকে নিয়ে গিয়ে লাভ কি বলুন, আপনি ত অত্যাচার ছাড়বেন না। অত কুপথ্যি করলে রোগ সারে ?

কুপথ্যি, বল কি অমল। আমার মেয়েটা বুঝি লাগিয়েছে।—অবিনাশের কাশির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। অমলকে ধৈর্য্য ধ'রে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে অবিনাশ বলে—পথ্যিরই পয়সা জোটে না তা কুপথ্যি করব কোথা থেকে বল।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, অমল জানে।

আচ্ছা এবার ঠিক নিয়ে যাব। বলে সে চলে যাবার উপক্রম করতেই অবিনাশ তার জামার প্রান্তটা নোংরা জীর্ণ আঙুলে ধ'রে ফেলে।

একটু ভালো ওযুধ হ'লেই আমার এ রোগ সেরে যায়, প্রেসের চাকরীটা এখনো তাহ'লে করতে পারি। আমায় না হয় একটা হাসপাতালেই ব্যবস্থা ক'রে দাওনা ভাই।

হাসপাতালে কি সহজে যাকে তাকে নিতে চায়।—অমল জামার প্রান্তটা একরকম জোর ক'রে ছাড়িযে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু অবিনাশ নাছোড়বান্দা। এবার গলা যথাসাধ্য নামিয়ে আসল প্রস্তাবটা সে ক'রে ফেলে,—চারটে খুচরো পযসা তোমার কাছে হবে ভাই। আমি কালই দিয়ে দেব।

অমলের কাছে কলেজে যাবার ট্রাম ভাড়ার বেশী পয়সা সত্যিই থাকে না। পিসিমা সে দিকে অত্যন্ত সাবধানী। তবু অবিনাশের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সে চারটে পযসা তাড়াতাড়ি বা'র করে দেয়। হপ্তা খানেক অন্ততঃ অবিনাশ আর তাহ'লে তাকে বিরক্ত করবে না সে জানে। এক হপ্তাই বা তার আর পরমায়ু।

রাস্তায় বেড়িয়ে প'ড়ে অমলের মনে হয় রাস্তার কলে হাতটা ধুযে ফেল্লে হয়। পয়সা দেবার সময় অবিনাশের ঘর্ম্মাক্ত ভিজে ঠাণ্ডা হাতটার স্পর্শ লেগে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হ'তে থাকে।

কিন্তু অমলের হাত ধোয়াও হয় না। কোন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। নিজের সম্বন্ধে কেমন একটা লজ্জা।

লরীতে সমস্ত মাল বোঝাই ক'রে অমলই সবার শেষে এ বাড়ী ছেড়ে যায়। পিসিমা আর সকলের সঙ্গে ঘর দোর গুছোবার জন্যে আগেই নতুন বাসায় গিয়ে উঠেছেন।

শেষ মালপত্র তুলে, বোঝাই করা লরীর ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে ব'সে সে হুকুম দেয়, 'চালাও'।

পিছন ফিরে আর সে তাকাতেও চায় না। এখানকার কোন ভাবনা তার মনে অস্বস্তি যেন না জাগায়, তার নতুন পাওয়া মুক্তির অনুভূতি যেন ক্ষুণ্ণ না করে।

আসবার সময় সকলের কাছে সে নেহাৎ আলগাভাবে বিদায় নিয়ে এসেছে।

সকলের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি। দিনের বেলাকার মুখোস খুলে গভীর রাত্রে যে মেয়েটি লুকিয়ে কাঁদে, সে তখন সম্ভবত নিজের কাজের ধান্দাতেই বাড়ী ফেরেনি। শুধু রুগ্ন অবিনাশ মানা সত্ত্বেও জোর ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে গলির মুখ পর্য্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে চার আনা পয়সা ধার চেয়ে নিয়েছে, ডাক্তার দেখাবার কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতেও ভোলেনি।

অমল কোন উত্তর দেয়নি। সত্য মিথ্যা কোন উত্তরই সে আর দিতে চায় না। এখানকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক তার শেষ। এ আবেষ্টন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে এইটুকু শুধু সে মনে রাখতে চায়।

এ ভাড়াটে বাড়ীর জীবনযাত্রা আবার এমনি ক'রেই চলবে সে জানে। তাদের খালি করা ঘরে আবার আর কোন দুঃস্থ পরিবার

এসে কালই হয়ত আশ্রয় নেবে কি দরকার এ সব ভাবনার—ভেবে সে কিছু করতে পারে!

লরীতে ষ্টার্ট দেওযা হয়। সশব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে লরীটা যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গে অমলের দৃষ্টি হঠাৎ আপনা থেকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে।

কাদামাথা বেড়াল ছানাটা কখন সেখানে ম'রে প'ড়ে আছে।